নহ দেবী

প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রকাশক □ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯

নহ দেবী : প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৮,
২১ ট্যামার লেন কলকাতা-৯ থেকে 'প্রকাশক' প্রকাশনা সংস্থার পক্ষে রবি দত্ত
প্রকাশ করেছেন এবং সত্যনারায়ণ প্রেস ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন কলকাতা-৬
থেকে হরিপদ পাত্র ছেপেছেন। প্রচ্ছদ শিল্পী : প্রণবেশ মাইতি।

শিশির ভট্টাচার্য

প্রীতিভাজনেষু

নহ দেবী

কিন্তু দানবীও নয় নিশ্চয়

তা হ'লে শুধুই কি মানবী ?

না, তাও নয়।

যুগে যুগে নারীর যে অনন্ত অতল রহস্য

কবি দার্শনিক সাহিত্যকারদের

বিভ্রান্ত বিহ্বল করেছে

তারই মর্ম সন্ধানে তিনটি অসামান্য রূপসৃষ্টি

এখানে একাধারে

স্বপ্ন-কায়া-তাপসী হিসাবে উপস্থিত বলা যায়।

১

কলিকাতা

২৩শে ডিসেম্বর ১৯…

সবিনয় নিবেদন,

জীমূতবাবু, আপনি এ চিঠি পেয়ে একটু অবাক হবেন বলেই মনে হয়। অন্ততঃ অত্যন্ত দাম্ভিক ও আত্মাভিমানী না হলে একটিমাত্র লেখা প্রকাশিত হবার পর ভক্ত পাঠকের প্রশংসাপত্র পাওয়া কেউ স্বাভাবিক বলে তাচ্ছিল্য করতে পারে না।

এখানে অবশ্য একটা কথা ব্যাখ্যা করবার আছে। আপনার একটি মাত্র রচনা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া আমার হয়ত ভুল হ'তে পারে। তবে আমি বই কাগজ পত্র-পত্রিকার অত্যন্ত নিয়মিত পাঠক। নামকরা পত্র-পত্রিকা ত বটেই—নেহাৎ নগণ্য সব কাগজও আমার চোখ এড়ায় না। লেখাটেখা ত বটেই প্রত্যেক কাগজের বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত আমি তন্নতন্ন করে খুঁটিয়ে পড়ি। তাতে জীমূতবাহন বলে কোনো লেখকের নাম কখনো চোখে পড়েনি বলেই আপনার এই উপন্যাসটি প্রথম লেখা বলে মনে করছি।

অবশ্য আপনি অন্য ছদ্মনামে যদি কিছু লিখে থাকেন সে আলাদা কথা। তবে সেরকম কিছু লিখে থাকলেও তার সঙ্গে এ লেখার কোনো আত্মীয়তা নেই। থাকলে আমার মত পাঠিকার তা অগোচর থাকত না। আপনার এ লেখায় কয়েকটি বিশেষত্ব এটিকে একেবারে স্বত[illegible] করে রেখেছে বলেই আপনাকে আমার সাধুবাদটুকু জানানো উচিত [illegible]ন করলাম। এর সঙ্গে আশা রাখছি যে জীমূতবাহন নামটি অদূর ভ[illegible]তে আরো দেখতে পাব।

আপনার লেখাটি আমার ভালো লাগা যে যথার্থ তার একটা প্রমাণ এই

চিঠিটিই দিচ্ছে। জীমূতবাহন নামের মধ্যে ত আপনার ঠিকানা প্রচ্ছন্ন নেই। সে ঠিকানা যোগাড় করতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছে। লেখাটি যেখানে বেরিয়েছে সে পত্রিকার সম্পাদক ত প্রথমে ঠিকানা জানেন না বলেই আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন।

জানেন না বলাটা পুরোপুরি তাঁর মিথ্যাভাষণ হয়ত নয়। আপনি ত এখনো নামকরা লেখক নন যে আপনার নামধাম ঠিকানা সম্পাদকের মুখস্থ থাকবে। হয়ত আপনি কোনো আশা না রেখে একেবারে ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি এ পত্রিকার সম্পাদকের দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদক যে মনোনীত করবেন এমন আশাও হয়ত আপনার ছিল না।

সম্পাদক মশাই-এর কিছু কর্তব্যবোধ রসজ্ঞান তবু আছে বলে মনে হচ্ছে। প্রথমতঃ লেখাটা তিনি সত্যিই পড়েছেন আর তারপর প্রকাশ করেছেন। লেখা ছাপলেও নতুন লেখকের ঠিকানা তিনি মনে করে রাখতে যাবেন কোন দুঃখে। ফোনে আমার আবদার শুনে তিনি একটু বিব্রতই হয়েছেন নিশ্চয়। আমার আবদার রাখতে হলে খাতাপত্র ঘেঁটে ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে হয়। অত ঝামেলার চেয়ে ঠিকানা জানা নেই বলেই হ্যাঙ্গামাটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

কিন্তু তিনি এড়াতে চাইলে কি হবে, আমি যে একেবারে নাছোড়বান্দা। ফোনে বিফল হওয়ার পর চিঠি লিখেছি, একটা দুটো নয় পরপর তিনটি। তাতে শারদীয় সংখ্যার সম্পাদনাকে একেবারে আকাশে তুলে প্রশংসা করায় সম্পাদকের মন শেষ পর্যন্ত গলেছে। তিনি খাতাপত্র খুঁজে পেতে আপনার ঠিকানাটা আমার পাঠানো রিপ্লাই কার্ডে না জানিয়ে পারেন নি।

ঠিকানা পেলেও এ চিঠি লিখব কিনা প্রথমে ঠিক করতে পারি নি। কাছাকাছি কোথাও আপনার নিবাস হ'লে এ চিঠি হয়ত শেষ পর্যন্ত লিখতাম না। আপনাকে প্রশংসা জানাবার জন্যে অন্ততঃ আরো দু-একটা লেখা বার না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম।

কিন্তু আপনি সুদূর কর্ণাটকে থাকেন জেনে আপনার সম্বন্ধে কৌতূহলটা একটু বেশী হয়েছে, দ্বিধাটাও তত প্রবল হয় নি। শহরটার নাম দেখছি গুলবার্গা। এটা আবার কিরকম শহর ? অত দূরের জায়গায় আপনি কি করেন জানতে ইচ্ছে করে।

সে ইচ্ছে কি আর পূরণ হবে !

মিথ্যে বিনয় টিনয় অবশ্য করব না। অনুরাগী পাঠকের চিঠির উত্তর দেন বা না দেন চিঠিটা যে আগাগোড়া পড়বেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমার নেই।

একটা উত্তর যদি সত্যিই দেন তাহলে আপনার লেখাটা সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করবার ইচ্ছে আছে। নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীত

নির্মলকুমার রায়

চিঠিটা যথাসময়েই পৌঁছেছিল।

পড়ে খুশি হলেও উত্তর দেবে না বলেই ঠিক করেছিল জীমূত।

উত্তর দেবার আছেই বা কি ?

আমার লেখাটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে কৃতার্থ হলাম এই রকম গোছের কিছু ছাড়া আর কি-ই বা লিখবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই উত্তর একটা দিতে হয়েছে, কারণ দ্বিতীয় একটা চিঠি এসেছে আবার কিছুদিন বাদেই।

এবার চিঠিটা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সুরটা যেন একটু বেশী হাল্কা। চিঠিটা হল—

সবিনয় নিবেদন,

কি হল কি জীমূতবাবু। দু লাইন একটা উত্তর দিতেও পারলেন না। আর কিছু না হোক চিঠিটা যে পেয়েছেন তা জানাবার মত কালি আর সময় খরচ করতেও আপত্তি !

এ চিঠিরও উত্তর না পেলে ছাড়ব মনে করবেন না। তৃতীয় চিঠি ঠিকই যাবে। ইতি—

নাছোড়বান্দা

নির্মলকুমার

এ চিঠির পর একটু ভাবনাতেই পড়েছিল জীমূতবাহন। সৌজন্যের দিক দিয়ে চিঠি একটা দেওয়া উচিত বলেই তার মনে হয়েছে। কিন্তু সে চিঠির যদি আরো জের টানতে হয় ?

প্রথম লেখা বার হওয়াটাই তার কাছে একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দ বিস্ময়ের ব্যাপার। তার ওপর লেখাটি প্রকাশ হতে না হতেই অজানা একজন পাঠকের কাছ থেকে এরকম প্রশংসার চিঠি পেয়ে খুশি যে হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু দ্বিধা ভয় তার এর পরের পরিণতি সম্বন্ধে। চিঠির উত্তর একবার দিলে যদি তা নিয়মিত দেওয়া নেওয়ার একটা দায় এসে যায় তাহলেই ত মুস্কিল।

চিঠি লেখার ব্যাপারে সে নিতান্ত অলস ও অনিচ্ছুক। পারতপক্ষে সে যে জন্যে কলম ধরে না।

এ ব্যাপার নিয়ে কারুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু কার সঙ্গে করবে !

যেখানে সে থাকে সেখানে বাঙালীই মাত্র সে একা। অন্য যারা আছে তারা তার লেখাটেখার বাতিকের কথা জানেও না। কোনো পত্রিকায় তার যে লেখা বেরিয়েছে তা ত নয়ই।

অনেক ভেবেচিন্তে জীমূত একটা ভদ্র অথচ আলগোছে দূরত্ব রাখা গোছের চিঠি লিখলে—

সবিনয় নিবেদন,

আমার প্রথম প্রকাশিত লেখাটি আপনার ভালো লাগিয়াছে জানিয়া সত্যই অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। এইটিই আমার প্রথম প্রকাশিত লেখা। স্বনামে বা ছদ্মনামে ইতিপূর্বে আমার কোনো লেখা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। জীমূতবাহন নামটি আমার ছদ্মনাম।

আমার কৃতজ্ঞ নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত

জীমূতবাহন মল্লিক

এ চিঠিতে ব্যাপারটা চুকে গেছে বলেই মনে হয়েছে জীমূতের। কারণ বেশ কিছুদিন নির্মলকুমারের চিঠি আর আসেনি। এ বিষয়ে অন্য কোনো কারুর ত নয়ই।

ইতিমধ্যে সাহস করে পাঠানো জীমূতের লেখা দু জায়গা থেকে ফেরৎ এসেছে। যে পত্রিকায় তার প্রথম উপন্যাসটি ছাপা হয়েছিল সেখান থেকেও তার পাঠানো একটি লেখা সম্বন্ধে কোনো খবর আসে নি। উপযুক্ত ডাকটিকিট দেওয়া সত্ত্বেও লেখাটি এখনো যে ফেরৎ পাঠানো হয় নি এইটেই ক্ষীণ একটু আশা জাগিয়ে রেখেছে।

তার প্রথম ও এ পর্যন্ত একমাত্র ভক্ত নির্মলকুমারের চিঠির কথা এক আধবার মনে হয়েছে এই সময়ে। ভদ্রলোকের তার লেখাটা পড়ে যে ভালো লেগেছে, এটা নেহাৎ তুচ্ছ করবার জিনিষ ত নয়। তার লেখা যে একেবারে বিফল হয়নি ওই একটি মানুষের সাধুবাদই তার প্রমাণ।

সে সাধুবাদকে তুচ্ছ অবশ্য সে করেনি, কিন্তু এখন মনে হয়েছে যে ভদ্রলোকের কাছে অতটা দূরত্ব রাখা গাম্ভীর্যের ভঙ্গি না দেখালেই পারত।

ভদ্রলোকটি কিরকম সে বিষয়েও একটু কৌতূহল এবার হয়েছে। চিঠির ভাষা ভঙ্গি দেখে খুব বেশী বয়স বলে ত মনে হয় না। বিশেষতঃ দ্বিতীয় চিঠিটাতে ত ভারিক্কি প্রবীণতার কোনো চিহ্নই নেই।

চিঠি দুটো বার করে আর একবার পড়ে দেখেছে জীমূত। পড়তে পড়তে কেমন একটু খট্‌কাই লেগেছে মনে। হাতের লেখাটাও একটু যেন কি রকম মনে হয়েছে এখন।

অথচ প্রথম চিঠি পাওয়ার পর এসব কিছু খেয়াল করে নি।

নিজের মনেই ভদ্রলোক সম্বন্ধে একটু রহস্যভেদের খেলা খেলেছে এবার। ভদ্রলোক কি সত্যিই ভদ্রলোক বলে সম্বোধন করবার যোগ্য। না, নেহাৎ ছেলে-ছোকরা ?

ছেলে-ছোকরা হওয়ার সম্ভাবনাই যেন বেশী মনে হয়। অন্ততঃ দ্বিতীয় চিঠিটা দেখে। তবে ছেলে-ছোকরা হলেও অর্বাচীন একেবারেই নয়।

প্রথম চিঠিতে ভাষার বাঁধুনি আর বিচার বিশ্লেষণের ধরণটা দেখলেই তা বোঝা যায়।

ভদ্রলোককে একেবারে মুখ বন্ধ করে দেবার মত ওরকম কাটাছাঁটা নীরস চিঠি না দিয়ে একটু যোগসূত্র রাখবার সুযোগ রাখলে হত। দেশের সাহিত্যের আবহাওয়ার খবর ত তাতে পাওয়া যেত একটু-আধটু।

এখন আর অবশ্য সে আফশোষ করে লাভ নেই। নিজে থেকে গায়ে পড়ে আবার তাঁকে চিঠি লেখা যায় না।

গায়ে পড়ে চিঠি লেখার দরকার হল না। চিঠি আবার এল। একেবারে অপ্রত্যাশিত অন্য ধরণের চিঠি।

তার প্রথমটা একেবারে যেন ভাটপাড়ার পণ্ডিতের লেখা—

"শ্রীল শ্রীযুক্ত জীমূতবাহন মল্লিক ছদ্মনামা লেখক মহোদয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার প্রেরিত অমূল্য পত্রখানি যথাসময়ে ডাকযোগে প্রাপ্ত হইয়া এ মরজীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছি। অতঃপর·········

এইটুকু লেখবার পরই নিচের লাইন একেবারে যেন হাসিতে ফেটে পড়েছে।

বলি, ভেবেছেন কি মশাই! কেউ লেখার প্রশংসা করলে তাকে কি করে চিঠি লিখতে হয় তাও জানেন না। গুরুগম্ভীর চালে পাকা বুড়োটি যে সেজেছেন তার ফাঁকি যে সব কিছুতে ধরা পড়ে যাচ্ছে। প্রথমতঃ জীমূতবাহন আপনার ছদ্মনাম নয়, দ্বিতীয়তঃ আপনি বয়সে প্রবীণ হতে পারেন না।

আপনার উপন্যাসটার সঙ্গে এ চাল যে মোটে খাপ খাচ্ছে না সেটা বোধহয় খেয়াল করেননি।

শুনুন, গোটাকতক শক্ত সোজা কথা বলি। আপনার লেখাটির মধ্যে ওই আপনাদের কেতাবী সমালোচনার ভাষায় যা বলে, সেই প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু তাই বলে আপনি এখনি এমন একটা কেওকেটা হয়ে ওঠেন নি যে প্রশংসার চিঠি পেয়ে তাতে অরুচি ধরে গেছে।

শুনুন, শুধু প্রশংসা নয় আপনার ও উপন্যাস সম্বন্ধে আমার নিন্দে করবার অনেক কিছু আছে। প্রথম চিঠিতেই সেগুলো লিখে আপনার মন খারাপ করতে চাইনি।

আপনাকে আর কেউ ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছে কিনা জানি না। দিয়ে থাকলেও আমার চিঠি আমারই। তার সঙ্গে কারুর মিল হতে পারে না।

আমি বা আপনার অন্য ভক্ত পাঠকেরা আপনার লেখা পড়ে প্রশংসা বা নিন্দার ছলে যা বলবে তাই যে আপনাকে মেনে চলতে হবে এমন কোনো কথাই নেই। বরং যে যাই বলুক নিজের রাস্তা ধরে চলাই আপনার দরকার।

কিন্তু কথাগুলো শুনতে দোষ কি ? অন্ততঃ যাদের জন্যে লিখছেন তাদের মনগুলোর একটু পরিচয় তাতে পাবেন।

আজ অবশ্য লেখাটেখা নিয়ে কিছুই আপনাকে বলছি না। সে সব এখন মুলতুবি রইল।

আপাততঃ সোজা কটা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না কেন ?

গুলবার্গায় আপনি করেন কি ? কতদিন ওখানে আছেন ? কবে থেকে লিখছেন সে কথা জানতে চাই না, কিন্তু নতুন কোনো লেখায় হাত দিয়েছেন কি ?

এই তিনটে সামান্য কৌতূহল আমার মেটাবেন ? যদি তাড়াতাড়ি মেটান তাহলে আপনাকে এমন একটা আশ্চর্য খবর দেব যা আপনি কল্পনাও করতে পারেন না। আচ্ছা, আসি। নমস্কার। ইতি—

বিনীত

নির্মল

এবার কেন ঠিক জানে না। চিঠির জবাব দেবার একটু উৎসাহ জীমূতের হ'ল। এবং এ চিঠির উত্তর দিলে বেশ একটু তাড়াতাড়িই। তার চিঠিটা দীর্ঘ নয় কিন্তু ভাষা ও ভঙ্গি অনেকটা সহজ স্বাভাবিক। চিঠিটা এই—

প্রীতিভাজনেষু,

নির্মলবাবু, আপনার তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি। গুলবার্গায় আমি একটা ব্যবসা করি। এখানে আছি সারাজীবনই। আর নতুন কোন লেখায় হাত দিই নি। যে লেখাটি ছাপা হয়ে আপনার প্রশংসা পেয়েছে সেটি আমার যৌবনকালের লেখা। সত্যিই আমি বৃদ্ধ। এই বৃদ্ধ বয়সে আর নতুন কিছু লেখার ইচ্ছে বা উৎসাহ নেই।

আমার মত লেখকের রচনা সম্বন্ধে আপনি যেটুকু আগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে আবার আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নমস্কার নেবেন। ইতি—

বিনীত

জীমূতবাহন

এ চিঠির উত্তর একরকম পত্র পাঠই এল।

জীমূতবাহনবাবু,

আপনি আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছেন, তাই আপনাকে যে আশ্চর্য খবর দেব বলেছিলাম তা আর দিচ্ছি না।

আপনার মিথ্যেগুলো একেবারে জলের মত পরিষ্কার। এক এক করে ধরিয়ে দিচ্ছি দেখুন। প্রথমতঃ জীমূতবাহন যে আপনার ছদ্মনাম মোটেই নয়, আর আপনি বয়সে প্রবীণ হতেই পারেন না সে কথা আগেই বুঝে আপনাকে আগের চিঠিতে জানিয়েছি।

আপনি গুলবার্গায় আজীবন আছেন ও সেখানে ব্যবসা করেন এসব কথাও ডাহা মিথ্যে। আপনি আজীবন গুলবার্গায় থাকলে হয় অতি পরিচয়ের জন্যে ও শহর আপনার কাহিনীর পটভূমিকা করার উৎসাহ বোধ করতেন না, নয় ও শহরের আরো অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ পরিচয় আপনার লেখায় পেতাম।

তার বদলে কাহিনীটার একটা পশ্চাৎপট না দিলে নয় বলে, আপনি ভাসাভাসা ভাবে শহরটাকে বর্ণনা করেছেন।

আর ব্যবসা! আপনি যদি সত্যিই বৃদ্ধ হতেন আর আজীবন গুলবার্গায় থেকে ব্যবসা করতেন তাহলে কতবার যে আপনাকে লালবাতি জ্বালতে

হত তার ত হিসেব হয় না।

না, জীমূতবাহনবাবু, এ সব সস্তা ধাপ্পায় আমাকে ঠকাতে পারবেন না। আপনি কি ভাবেন, আমি আপনাকেই এই প্রথম চিঠি লিখে এ কাজে হাতে খড়ি করছি ?

ভুল ! একেবারে ভুল ! আমি এখনকার অতি বড় থেকে অতি ছোট বহু লেখকের সঙ্গেই এমনি চিঠি লেখালিখি করি। ওটা আমার একটা নেশা, রোগও ভাবতে পারেন।

সকলের কাছ থেকেই যে খুব ভালো সাড়া পাই তা অবশ্য বলব না। কেউ চটপট উত্তর দেন, কেউ দেরী করেন, কাউকে আবার খুঁচিয়ে জবাব দেওয়াতে হয় ; দু একজন মোটে জবাবই যে দেন না, সে কথাটাও অস্বীকার করব না। কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে লেখকদের সঙ্গে আর কিছুতে না হোক চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে আমার যোগাযোগটা নেহাৎ সামান্য নয়।

সেই যে কথায় বলে, অন্যেরা হাঁ করলে কেউ কেউ অন্যের পেটের কথা বুঝতে পারে, বেশীর ভাগ লেখকের বেলা আমি সেই কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি যে কলমের আঁচড় কাটা দেখেই আমি তাঁদের ভেতরটা এক্স-রেতে দেখতে পাই।

বড় অহঙ্কার ভাবছেন ! তা একটু অহঙ্কার করতে পারি কিনা, আপনি নিজেকে দিয়েই বিচার করে দেখুন না। আপনি ত গোড়া থেকেই নিজেকে বেশ একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন! পেরেছেন কি ! আপনার সব ছলনা যে ধরে ফেলেছি তা আপনি বুকে হাত দিয়ে স্বীকার না করে পারবেন !

এখন বৃথা চালাকি আর না করে সত্যি করে আমার প্রশ্ন কটার উত্তর দিন ত !

দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ওই গুলবার্গার মত নামের শহরে আপনি কি করতে কেমন করে গিয়ে জুটলেন ! আমি ইতিমধ্যে গুলবার্গা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে কিছু কিছু জেনেছি। ওটা ত অনেক আগে বাহ্‌মনী

রাজত্বের রাজধানী ছিল তারপর এসেছিল নিজামের অধিকারে। এখন পড়েছে কর্ণাটকের মধ্যে। থাকবার মধ্যে ওখানে ত কিছু ইসলামী স্থাপত্যের নমুনা আছে যার ভেতর স্পেনের কর্ডোভা শহরের মূরদের তৈরী এক মসজিদের হুবহু নকলটাই সব চেয়ে নামকরা।

আপনার উপন্যাসে অবশ্য এ মসজীদের একটু উল্লেখ আছে। কিন্তু শহরটা ত একেবারে আলাদা জাতের। ওখানে আপনি ছাড়া বাঙালী আর কেউ আছে বলে ত আমার বিশ্বাস হয় না।

ওখানে কেন কোথায় আছেন লিখবেন? আর নতুন কিছু লিখছেন কি না তাও জানাবেন। তাড়াতাড়ি।

তাহলে সেই অবাক করা খবরটা এখনও আপনাকে দিতে পারি। নমস্কার।

ইতি—

নির্মল

জীমূত তাড়াতাড়িই এ চিঠির জবাব দিয়েছে। দিয়েছে আগ্রহভরেই। কারণ এবার যেন এই চিঠি লেখালেখির মধ্যে একটা রস আর মজা পেয়েছে। তাছাড়া একটি লেখা আগের পত্রিকাতেই মনোনীত হওয়ার খবর পেয়ে মনটা তখন খুশি। চিঠি অবশ্য বড় করে নি। লিখেছে—

নির্মলবাবু,

আপনি আমাকে সত্য কথাটা স্বীকার না করিয়ে ছাড়লেন না। আপনাকে যা জানাচ্ছি দয়া করে সাহিত্যের বাজারে কারুর কাছে তা ফাঁস করে দেবেন না, এই অনুরোধ।

আপনার সঙ্গে লেখকদের চিঠি লেখালেখি চলে বলেই আমার কথাটা জানাজানি হয়ে যাবার ভয়।

আপনি অনুমানে খুব ভুল করেন নি। আমি সত্যিই বৃদ্ধ নই আর গুলবার্গায় বাঙালী নেই বললেই হয়। তবে আমি ছাড়া আর একজন বাঙালী এখানে আছেন। তিনি আমার স্বামী শ্রী জীমূতবাহন মল্লিক। আমার নিজের নাম হ'ল যমুনা।

স্বামীর নামটা আমি অনেক ভেবে চিন্তেই ব্যবহার করেছি। কারণ লেখা

ছাপাবার ব্যাপারে আমি মেয়েছেলে হবার অন্যায় প্রশ্রয়টুকু চাই নি। আমার স্বামী এখানে একটি রঙের কারখানায় কেমিষ্ট হিসেবে কাজ করেন।

নতুন কিছু সত্যিই লিখছি না। একটা আগেকার লেখা বেশ কিছুদিন হ'ল পাঠিয়েছি। তার কি গতি হ'ল এখনো জানি না। আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীতা

শ্রীমতী যমুনা মল্লিক

পুঃ—আপনি যে অবাক করা খবর দেবেন বলে লোভ দেখিয়েছেন তা আমি বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছি। এই একটি আঠা দিয়ে আঁটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটিতে সে কথা লেখা রইল। এখন নয়, নিজে থেকে এ রহস্য আমার কাছে উদ্‌ঘাটন করার পর খুলে পড়ে দেখবেন।

—যমুনা

ওপরের চিঠির উত্তর ঃ

শুনুন, যমুনা মল্লিক মশাই,

আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আপনি কোন হাটে ছুঁচ বেচতে এসেছেন সেটা খেয়াল আছে?

হ্যাঁ, আপনি আমার অবাক করা খবরটা যা বুঝে ফেলেছেন তাই ঠিক। বুঝে ফেলাটায় বাহাদুরী কিন্তু খুব বেশী নেই, কারণ আমি গোয়েন্দা গল্পে যেমন থাকে তেমনি আমার আগের চিঠিতে একটি স্পষ্ট হদিশ ছড়িয়ে দিয়ে এসেছিলাম।

এ রকম ক্লু আমি অন্য সব লেখকদের কাছে লেখা চিঠিতেও কৌশলে কোথাও না কোথাও ফেলে রাখি। কেউ কেউ সে হদিস লক্ষ করে শেষ পর্যন্ত রহস্যটা ভেদ করতে পারেন, কেউ কেউ কোনদিনই তা পারেন না।

না পারার জন্যে তাঁদের বুদ্ধির দোষ অবশ্য আমি দিই না। আসলে তাঁরা হয়ত তেমন মনযোগই দেন না। আর দেবেনই বা কেন? ভক্ত পাঠকের

চিঠি পেলেই গদগদ হয়ে তা একেবারে আতসকাঁচ ধরে পড়বার দায় ত তাঁদের নেই।

আপনারই যে তা আছে আর সেই জন্যেই রহস্যটা আপনি একটু তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছেন এমন কথা অবশ্য বলছি না। তবে অন্য অনেকের তুলনায় তাড়াতাড়ি ধরে ফেলায় আপনি, ওই কি বলে পর্যবেক্ষণ শক্তি আর বিচক্ষণতার একটু তারিফ পাবার যে যোগ্য একথা স্বীকার করছি।

কিন্তু ওই রহস্যটুকু ভেদ করার পর একটি স্বামী খাড়া করে শ্রীমতী যমুনা মল্লিক সাজা যে আহাম্মুকীর চূড়ান্ত সেটুকু খেয়াল হওয়া উচিত ছিল না কি?

আপনি মার কাছে মাসির গল্প শোনাচ্ছেন! আমাকে বোঝাতে চাইছেন যে ওই উপন্যাসটির আপনি লেখক নন লেখিকা।

শুনুন মল্লিক মশাই! আপনার উপন্যাসটি কোথায় কাঁচা জানেন? কাঁচা মেয়েদের মনের খবর জানবার ব্যাপারে, সেইখানেই আপনি গোড়া থেকেই ধরা দিয়ে বসে আছেন।

আমার লেখাটির প্রশংসার সঙ্গে আমার বিরূপ সমালোচনা করবারও যে কিছু আছে তা আপনাকে এর আগে একটু জানিয়েছি। সে সমালোচনা এই মেয়েদের মন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিছু আবোল তাবোল বলার জন্যে।

একটু বুদ্ধিমান পাঠিকা হলে আপনার লেখার ওই সব জায়গা পড়ে মনে মনে একটু হাসবেই। আপনার পুরুষ পাঠকদের খট্‌কা লাগুক বা না লাগুক এই মেয়ে পাঠিকাদের কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবেন না।

এটুকু তারা বুঝবেই যে নিজে মেয়ে লেখিকা হলে কখনো আপনি এতটা ভুল করবেন না।

আমার লুকোনো কথাটা যখন ঠিক ধরে ফেলেছেন তখন বুঝতেই পারছেন আমার কাছে নিজেকে লেখিকা বলে আপনার চালাবার চেষ্টা কেন বৃথা।

রহস্যটা কবে ধরতে পারলেন জানতে একটু কৌতূহল অবশ্য সত্যিই হচ্ছে। প্রথম চিঠি পাবার পরই নিশ্চয় নয়। স্পষ্ট হদিশটা তাতেই অবশ্য দেওয়া ছিল।

আপনার আঠা দিয়ে এঁটে বন্ধ করা চিরকুটটিতে সে কথা কিছু জানানো নেই। আপনার অনুমান অবশ্য সম্পূর্ণ সঠিক। আমি নির্মল কুমার নয়, শুধুই—নির্মলা।

পুঃ—তাড়াতাড়ি একটা উত্তর কি পেতে পারি না?

'না, আপনার প্রথম চিঠি পড়েই রহস্যটা ভেদ করতে পারিনি'—উত্তরটা তাড়াতাড়িই দিয়ে তাতে এবার লিখলে জীমূত,—ধরতে পারলাম চিঠিগুলো আবার ফিরে পড়বার সময়ই, অবশ্য ওই প্রথম চিঠি থেকেই। ও চিঠিটা পড়বার সময়ই আমার কেমন একটা খট্‌কা লেগেছিল। কেন লেগেছিল তা অবশ্য তখন তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করিনি। আমার প্রথম প্রকাশিত লেখার একজন প্রশংসা করেছে এই ব্যাপারটার উত্তেজনা যে বেশ একটু ছিল সে ত আর অস্বীকার করে লাভ নেই। সেই উত্তেজনায় অন্য সবকিছু চাপা পড়ে গিয়েছিল।

এরপর আপনার চিঠিগুলোর উল্টোপাল্টা সুর সুরু করার পর সেগুলো আর একবার দেখতে গিয়ে একটা শব্দই যেন হঠাৎ নতুন করে চোখে পড়ল।

এক জায়গায় আপনি লিখেছেন,—"তবে সে রকম কিছু লিখে থাকলেও তার সঙ্গে এ লেখার কোনো আত্মীয়তা নেই। থাকলে আমার মত পাঠিকার তা অগোচরে থাকত না।"

'পাঠিকা' শব্দটা প্রথম বারে খেয়ালই করিনি মনে হয়। তা করলে লেখার ভুল বলে অগ্রাহ্য করা বোধহয় সম্ভব হত না। কোনো পুরুষের কলমে আর যে ধরণের ভুলই হোক পাঠক কখনো পাঠিকা হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়বার চোখে পড়তেই আপনার পরিচয় সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই রইল না। সন্দেহটা ইতিমধ্যে অন্য অনেক কিছুর দরুণ ভালো করেই অবশ্য জানতে শুরু করেছিল।

আপনার কাছে যা জরুরী প্রশ্ন তার জবাব আগে দিলাম। এবার আমি যা জিজ্ঞাসা করছি ঠিক মত তার জবাবটা তাড়াতাড়ি দেবেন বলে আশা করতে পারি ?

আমার প্রশ্নটা অবশ্য একটু ভূমিকা করে জানাতে হচ্ছে।

আপনি পাঠক নন, পাঠিকা সেটা মানতে এখন বাধ্য। কিন্তু পাঠিকা হলেই কি সবজান্তা বুদ্ধির বৃহস্পতি হয় নাকি। আপনি পুরুষ নয় বলেই মেয়েদের মনের ব্যাপারের অথরিটি হয়ে গেছেন ? শুধু তাই নয় মেয়েদের সম্বন্ধে ভুল করলে শুধু পুরুষই করে এটাও আপনার কাছে স্বতঃসিদ্ধ ?

শুনুন নির্মলা দেবী, আমার উপন্যাসে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ভুল যদি কিছু হয়ে থাকে তা জীমূতবাহনের নয়, হয়েছে এই যমুনারই।

এখন ভুলটা কোথায় কি হয়েছে একটু বলবেন ?

ওই! উনি আবার কেন ডাকছেন শুনে আসি। তার চেয়ে আজ বরঞ্চ এইখানেই থাক। আমার প্রশ্নের জবাবটা কিন্তু তাড়াতাড়ি চাই। ইতি—

আদি অকৃত্রিম যমুনা

এ চিঠির উত্তর আর আসে না।

দুদিন চার দিন যেতে যেতে দু হপ্তা চার হপ্তা কেটে গেল তবু কোনো সাড়া শব্দ নেই।

কি হ'ল কি তাহলে ?

নির্মলাদেবী রাগ করলেন ?

কিন্তু রাগ করবার মত কোন অন্যায় কিছু সে ত চিঠিতে লেখেনি! জীমূত না যমুনা এই নিয়ে কৌতুকটা একটু চালিয়ে গিয়েছে মাত্র।

ভদ্রমহিলার তাতে অসন্তুষ্ট হবার মত মেজাজ হবার ত কথা নয়। অন্ততঃ তাঁর এতগুলি চিঠিতে তাঁর একটা সুরসিকা বুদ্ধি ঝলমল চেহারাই ফুটে উঠেছে।

সেটা কি ভুল ? না তা হতেই পারে না।

ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলে নির্মলাদেবী অন্য কোনো কারণে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

তাঁকে কি আরেকটা চিঠি তাহলে লেখা যায় ? সেটাও ঠিক উচিত মনে

হয় নি।
ইতিমধ্যে জীমূতের দ্বিতীয় লেখাটি সেই আগের পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছে। এ ঘটনার আনন্দ উত্তেজনা নির্মলা দেবীর নীরবতায় যে একটু ম্লান হয়েছে নিজের কাছে এ কথা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছে না জীমূত।
নির্মলাদেবীর কাছে এ লেখাটি সম্বন্ধেও কিন্তু শোনবার ঔৎসুক্য জীমূতের ছিল। তিনি এতদিন ধরে একেবারে চুপ করে যাওয়ায় সে বিষয়ে হতাশই হয়ে পড়ছে ক্রমশ।
নির্মলা রায় কি সত্যিই আর চিঠি লিখবেন না? জীমূত আর তার লেখা সম্বন্ধে তাঁর সাময়িক উৎসাহ কি একেবারে শীতল হয়ে গেছে?
হওয়া অসম্ভব ত সত্যি নয়। তাঁর চিঠিপত্রেরও অন্তরঙ্গ ধরনে জীমূত একটু বেশী আশা করে ফেলেছিল। সেইটেই তার ভুল।
নির্মলা রায় নিজেই ত জানিয়েছেন যে নতুন পুরানো নানা লেখকের সঙ্গে পত্রালাপ করা তাঁর একটা নেশা।
সেই নেশায় অন্য নতুন কোনো লেখকের সঙ্গে পত্রালাপে হয়ত মেতে উঠেছেন!
মনটা যে বেশ একটু খারাপ হয়ে গেছে সে কথা অস্বীকার করবার নয়। সেটা জোর করে কাটিয়ে নিতে চেয়েছে নির্মলা রায়ের ওপর একটা অভিযোগ পাকিয়ে তুলে।
নির্মলাদেবী চিঠি আর লিখতে না চান লিখবেন না। তিনি নিজেই প্রথম চিঠি লিখে আলাপের সূত্রপাত করেছিলেন। জীমূত তাঁকে সাধ্য সাধনা করে চিঠি লেখায় নি। তাঁর নামটাও জীমূতের জানা ছিল না।
কিন্তু আচমকা লেখা বন্ধ করার আগে ভদ্রতার খাতিরে একটা কাজ করা কি নির্মলা রায়ের উচিত ছিল না।
জীমূতের কাহিনীতে মেয়েদের মন সম্বন্ধে একটা বড় গোছের ভুলের ইঙ্গিত দিয়ে তাকে একরকম উপহাসই করে তারপর এরকম একেবারে সম্পর্ক ছেদ করে দেওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় নয়?
জীমূতের লেখার ভুলটা কি ও কোথায় তা অন্ততঃ দেখাবার একটা

'নৈতিক দায়িত্ব' নির্মলা রায়ের আছে।

নির্মলা রায়ের সঙ্গে পত্রালাপ আবার শুরু করবার জন্যে নয়, এই নৈতিক দায়িত্বটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যেই তাঁকে একটা অন্ততঃ চিঠি লেখা উচিত মনে হয়েছে জীমূতের।

বেশ কয়েকবার কাটাকাটি করে যথাসম্ভব নীরস গোছের একটা চিঠির মুসাবিদাও সে করেছে তারপর ঃ

সুচরিতাসু,

নির্মলাদেবী, আপনাকে আবার একটু বিরক্ত না করিয়া পারিতেছি না। আপনি আমার উপন্যাসটিতে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার বহু নিদর্শন পাইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। একটু কষ্ট করিয়া সেগুলির একটু বিশদ পরিচয় দিলে আমি লেখক হিসাবে ভবিষ্যতে উপকৃত হইতে পারি। আশা করি আমার অনুরোধের কারণ বুঝিয়া এ নির্বন্ধাতিশয্য মার্জনা করিবেন। ইতি—

প্রীতি নমস্কারান্তে

জীমূতবাহন মল্লিক

এ চিঠি লেখার পর পাঠানো কিন্তু আর হয় নি। প্রয়োজনই হয় নি তার। কারণ নির্মলাদেবীর চিঠি হঠাৎ আশাতীত পাওয়া গেছে।

চিঠিটি খুবই ছোট। কিন্তু তার সুরটুকু একেবারেই দূরত্বের নয়।

জীমূতবাহনবাবু,

অনেকদিন চিঠি দিতে পারি নি। না দিতে পারার জন্যে খুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু উপায় ছিল না।

কিন্তু আমি না দিলেও আপনি কি ইতিমধ্যে একটা চিঠি দিতে পারতেন না? আমার নিশ্চয় অভিমান করবার অধিকার আছে। তা করতে অবশ্য পারলাম না।

অনেক কথা জমা হয়ে আছে। একটু সুবিধে হলেই লিখব।

আজ এই পর্যন্ত, নমস্কার নিন। ইতি—

নির্মলা

এ চিঠি পেয়ে জীমূত বেশ একটু বিমূঢ়ই বোধ করলে।

খুশি যে খুব বেশী হ'ল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে বিভ্রান্তও। কি মানে করবে এ চিঠির? নির্মলাদেবী কেন এতদিন চিঠি দিতে পারেন নি? বাধাটা কিসের? সেরকম কোনো সামাজিক পারিবারিক নিষেধের বাধা হ'লে নিজে থেকে চিঠি না দেবার জন্যে জীমূতের ওপর অনুযোগ করত না।

সে রকম কোনো বাধা না হলে নির্মলাদেবীর এই দীর্ঘ নীরবতার কারণ কি হ'তে পারে?

বিরক্তি ঔদাসীন্য কি ক্লান্তি যে নয় এ সংক্ষিপ্ত চিঠির আন্তরিকতাটুকুই তার যথেষ্ট প্রমাণ। সত্যিই এই চিঠিতেই প্রথম যেন একটু অন্যরকম অন্তরঙ্গতার সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নির্মলাদেবী সম্বন্ধে জীমূতকে নতুন করে জিজ্ঞাসু করে তুলছে তাতেই। এর আগে কোনো কৌতূহল তাঁর সম্বন্ধে ছিল না এমন নয়। কিন্তু তখন ভাসা ভাসা একটা ধারণা গড়ে তুলেই সে কৌতূহল একরকম মিটে গেছে।

কিন্তু ধারণা যা করেছে আসলের সঙ্গে কতখানি তার মিল। সত্যিই কেমন মেয়ে নির্মলা রায়? দেখতে কেমন? কত বয়স? কি করেন? বিবাহিত না অবিবাহিত? সংসারে তাঁর আছে কারা?

একবার এ বিষয়ে তাঁর চিঠিগুলি থেকে সখের গোয়েন্দাগিরি করবার চেষ্টা করেছিল। বেশী দূর তা আর এগোয় নি।

সামান্য দু-একটা সূত্র থেকে ছোটখাট যে ক'টি মীমাংসায় পৌঁছেছিল তা নিতান্ত মামুলী। যেমন,—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ক'টা আছে তার খোঁজ না নিয়েই মেয়েটি যে সত্যিকার শিক্ষিতা তা তাঁর লেখার বিচক্ষণ বিচার বিশ্লেষণের ধরণ দেখেই বোঝা যায়। অবস্থাও বেশ স্বচ্ছল হওয়ারই কথা। কারণ তা না হলে এত পড়াশোনা আর এত চিঠিপত্র লেখার অবসর আর উৎসাহ থাকত না।

চিঠিতে দেওয়া ঠিকানাটা থেকে কেমন এলাকা বা কি পরিবেশ সে সম্বন্ধে

কিছু হদিশ পাওয়া জীমূতের পক্ষে অন্ততঃ সম্ভব নয়। সে নিজে প্রবাসী বাঙালী। সারাজীবন উত্তর প্রদেশের আগ্রা কানপুরেই প্রায় কাটিয়েছে। বার কয়েক মাত্র কলকাতায় ক'দিনের জন্যে ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা থেকে সেখানকার বিষয়ে কিছুই তার বলার ক্ষমতা নেই।

নির্মলা রায় কি করেন তাঁর কোনো চিঠির কোথাও এখনো পর্যন্ত তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। তিনি বিবাহিত কি না, তাও না।

বিবাহিত না হওয়াটা ঠিক স্বাভাবিক যেন নয়। চিঠিপত্রের ভাষা ভঙ্গি থেকে খুব অল্প বয়সী বলে মনে হয় না। অন্ততঃ স্কুলে-পড়া মেয়ে নিশ্চয় নয়। বিয়ের বয়স তাহলে হয়েছে বলেই ধরে নিতে হয়। আর বয়স হয়ে থাকলে অবিবাহিত নেই ভাবাই ত উচিত। কিন্তু বিয়ে যে হয়েছে তারও কোনো আভাষ কোনো চিঠিতে পাওয়া যায় নি। বিবাহিত হলে লেখার মধ্যে যত অস্পষ্টই হোক অন্য একটু স্বুর কি থাকত না? ঠিক এই ধরণের চিঠি কি তাহলে লিখতে পারতেন?

না, সে নিজের কল্পনাকে অন্যায়ভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে। নির্মলা রায় সম্বন্ধে এ সব প্রশ্ন মনের মধ্যে উঠতে দেওয়াই তার অন্যায়।

তবে কেন হঠাৎ দুমাস তিনি নীরব হয়ে গেছলেন। কি তাঁর সত্যি হয়েছিল সে বিষয়ে একটু কৌতূহলী হওয়া অপরাধ নয়। সোজাসুজি কোনো প্রশ্ন অবশ্য সে করতে পারবে না। তবে চিঠি লেখালেখি আবার যখন সুরু হয়েছে তখন আশা করবে যে নির্মলাদেবী নিজেই হয়ত সে কথা এক সময়ে জানাবেন।

নির্মলা রায়ের এই শেষের চিঠিটার উত্তর জীমূত খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারে নি। বার তিনেক চিঠি লিখেও ছিঁড়ে ফেলতে হয়েছে তাকে। একদিকে অন্তরঙ্গতার সুর একটু বেশী গাঢ় হয়ে যাবার ভয় আরেক দিকে একটা কৃত্রিম দূরত্বের অস্বাভাবিকতার। এ দুদিক বাঁচিয়ে চিঠি লেখা সহজ নয়।

জীমূতের এ চিঠিও পাঠানো হয়ে ওঠে নি। তার আগেই তার সব দ্বিধা সঙ্কোচকে যেন লজ্জা দিয়ে নির্মলার পরের চিঠি এসেছে। চিঠিটি দীর্ঘ

শুধু নয় একেবারে কৌতূক চাঞ্চল্যে ভরা।

ও মল্লিক মশাই,

একেবারে বোবা হয়ে গেলেন যে! সম্পর্ক একেবারে ছেদ করে দেবেন ঠিক করেছেন নাকি। খুব বেশী বিরক্ত করছি নাকি? দু'মাস ত এতটুকু উৎপাত করিনি। অবশ্য বাধ্য হয়েই অত সুবোধ বালিকা হয়ে ছিলাম। তা কারণটা যাই হোক আপনি ত পুরো ষাটটি দিন রেহাই পেয়েছেন। তারপর একটু-আধটু জ্বালাতন যদি করি তাতে কি অত রাগ করতে হয়? আপনি না হয় আমার চিঠিগুলো না খুলেই ফেলে দেবেন।

না, না, একেবারে নর্দমায় ফেলে দেবেন না। তা ভাবলে বড় দুঃখ হয়। তার বদলে কোথাও একটা ফেলে রেখে দেবেন। তারপর কোনদিন একটু অবসর থাকলে বা হঠাৎ খেয়াল হলে একটা আধটা একটু পড়ে দেখবেন!

বড্ড সেন্টিমেণ্টাল শোনাচ্ছে? মনে হচ্ছে একেবারে কাদা প্যাচপ্যাচে মনটা? তা মেয়েদের এইরকম মনই ত আপনাদের পোনেরো আনা পুরুষের পছন্দ!

আজ নয় সেই আদ্যিকাল থেকে। যে মেয়ে প্রতিদানে কিছু চায় না শুধু দিয়েই যায়, যে নিজেকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিলিয়েই রাখে সারাক্ষণ, তার কি না জয়জয়কার আপনারা করে এসেছেন সেই পুরাণের কাল থেকে।

আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি! স্বামী বা প্রেমিক যার কথায় ওঠে বসে পুরাণ টুরানে এ রকম কোনো মেয়ের কথা কোথাও পড়েছেন?

আপনি আমার মত মূর্খ মেয়েছেলে ত নয়। পড়েছেন শুনেছেন নিশ্চয় অনেক। আপনার এরকম কোনো মেয়ের কথা মনে পড়ছে কি? পঞ্চ স্বামী নিয়ে যিনি ঘর করেছেন সেই দ্রোপদীর কথা একবার মনে হ'ল। কিন্তু পুরুষকে ওঠবোস করানো সে তেজ তাঁর কোথায়?

তেমন তেজ থাকলে কুন্তীদেবীর মুখ থেকে ভুল করে খসামাত্র পাঁচ ভাই-এর সঙ্গে তিনও সে নির্দেশ মেনে নিতেন ? যিনি লক্ষ্যভেদ করে তাঁকে জয় করলেন সেই অর্জুনই তাঁর মনোহরণ করেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু আপনি যাই বলুন ধনঞ্জয় ছাড়া কেউ আমার স্বামী নয় একথা জোরগলায় তিনি বলতে পারলেন কই ? না, না, ওই নির্বিবাদে মেনে নেওয়ার পেছনে ফ্রয়েড বা তেমন কাউকে পাঠাচ্ছি না।

আসল কথা ব্যক্তিত্বে দীপ্তিতে পুরুষকে ম্লান করে দেয় এরকম মেয়ে তখনও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তাদের কথা কেউ লেখেন নি। লিখতে চান নি। সাবধানে তাদের কথা সবাই বাদ দিয়েছেন।

এ সব যা লিখলাম তা পড়ে আমায় কিন্তু 'উইমেন্‌স লিব্‌'-এর পতাকা ওড়ানো এ যুগের স্যাফ্রেজিস্ট ভাববেন না। বুদ্ধি দিয়ে তা হতে চাইলেও হৃদয় মন আমার তাতে সায় দেবে না। সব লজ্জা গ্লানি দীনতা কলঙ্ক সত্ত্বেও সমর্পিত মেয়েদের দিকেই আমার মনের টান।

এই দেখুন বকতে বকতে আসল কথাই জানাতে ভুলে গেছি। আপনার দ্বিতীয় লেখাটা আমি এর মধ্যে পড়ে ফেলেছি যে !

এই যে বকবকানি তার পেছনে আপনার ওই লেখাটির কিছু যেন হাত আছে। আপনার ওই বরুণা মেয়েটির সঙ্গে মনে মনে যে ঝগড়া করেছি তারই একটু ঝাপ্‌টা বোধহয় এ চিঠির মধ্যে খানিকটা রয়ে গেল। বরুণার মত মেয়ে কোথায় যে আপনি পেলেন ? না, না, ও কথা থাক। আমার সেই পুরোণ নালিশে আর ফিরে যেতে চাই না।

আমাকে ভুল কিন্তু বুঝবেন না। সত্যি আপনার এ লেখাটিও আমাকে প্রায় এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করতে হয়েছে। অথচ আগের লেখার এটা একদিক দিয়ে একটা কপি বলা যায়। মূল গল্পের ছকটা অন্ততঃ এক। সেই এক ছকের কাহিনীকে আপনি যে পর পর দুবার একেবারে নতুন ব্যঞ্জনা দিয়েছেন সেইটেই আপনার বাহাদুরী।

আবার দেখুন মাত্রা ছাড়িয়ে অসময়ে অকারণে বাজে বকবক করছি। এটা কি সমালোচনা শোনাবার সময়। তবে চিঠির কলম থামাতে না

চাইলে সব কিছুই এমন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে হয়।

কলম কেন থামাতে ইচ্ছে করছে না জানেন? আজ এখানকার আকাশে এক আশ্চর্য সন্ধ্যা নেমেছে বলে। এই শীতের দিনে কলকাতার আকাশটা কি নোংরা বিশ্রী হয়ে থাকে তা বোধহয় জানেন।

আজ কিন্তু তুপুরবেলার এক অসময়ের অপ্রত্যাশিত ঝড় বৃষ্টির পর আকাশের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে গেছে। জানলা খোলবার হুকুম আমার নেই। কিন্তু কাঁচের সার্সির ভেতর দিয়ে যা দেখছি তাই আমার কাছে যথেষ্ট। যে দিকে চাই সব ঝকঝক করছে। ঝকঝক করছে আকাশের তারা রাস্তার আলোগুলো। দূরের বাড়ি ঘর গাছপালা সব।

আমি দেখছি আর কলম চালিয়ে যাচ্ছি। আপনি হয়ত এর মধ্যেই চিঠিটা সরিয়ে রেখেছেন জেনেও।

না, চিঠিটা আর লম্বা করব না।

কিন্তু জীমূত বাবু আপনার চিঠি যে আমার চাই-ই। তু ছত্র হলেও একটা তুটো চিঠি আমায় লিখতেই হবে আপনাকে।

কেন জানেন? আপনার চিঠি আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন কিছু বলে।

বিশ্বাস করুন, এমনিতে চিঠির কাঙাল আমি নই। নাম করা অনেক বড় ছোট লেখকের কাছ থেকে সত্যিই অনেক চিঠি আমি পাই।

কিন্তু ব্যাপার কি জানেন, সেগুলির বেশীর ভাগই পেশাদারী চিঠি। শুধু পেশাদারী নয় কোনো কোনোটির আবার বেশ একটু যেন অনুগ্রহ দেখিয়ে পিঠ চাপড়ানো ভঙ্গি।

তাছাড়া, তাছাড়া বলেই ফেলি আপনাকে। চিঠিতে একটু প্রেম-ট্রেম করবার চেষ্টাও কারুর থাকে। আপনাদের একজন সাহিত্যিক নিজেকে এত সুপুরুষ মনে করেন যে তাঁকে দেখলেই প্রেমে হাবুডুবু খায় বলে তাঁর ধারণা।

তিনি একবার লিখেছিলেন,—শুধু শুধু শুকনো চিঠি লিখে লিখে কি হবে! সাহস থাকে ত একবার সামনাসামনি দেখা করুন না।

দেখা করবার স্থান কালও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি তাঁকে লিখেছিলাম—আপনার লেখা পড়েই মোহিত হয়ে আছি। সামনাসামনি চোখে দেখলে আর ফিরে আসতে পারব না এই ভয়ে ও সৌভাগ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলাম।

আবার দেখুন যা তা বকছি।

আপনি কিন্তু চিঠি লিখবেন, লিখবেন, লিখবেন।

নির্মলা

এ চিঠির উত্তর দিতে দেরী করেনি জীমূত।

আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে চিঠিটা লিখতে পেরেছিল। লিখেও ছিল যেন বেশ কিছুটা কাছে থেকে।

চিঠিটা লেখার আগে কিন্তু মনের মধ্যে ভাবনা চিন্তার যেন ঝড় বয়ে গেছে একটা রাত। জিজ্ঞাসা আর সংশয়ের যেন অন্ত ছিল না।

নির্মলা রায়ের এ চিঠিই তাকে এবার কি রীতিমত স্পষ্ট করে তোলে নি? কতগুলো নিশানা ত চিঠিটার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে।

শুধু সেগুলোর মানেটা বোঝার যা সমস্যা।

কেমন মেয়ে নির্মলা কত বয়স বিবাহিত না অবিবাহিত এসব প্রশ্নের উত্তর যেন আর জানার দরকার নেই। কিছু না বলেও নির্মলা যেন সবই বুঝিয়ে দিয়েছে তার চিঠিতে।

না, বিবাহিত সে কখনোই নয়। বয়সও তার খুব বেশী হতে পারে না। খুব গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েও সে নয়। নিজের ইচ্ছামত চলবার স্বাধীনতা তার আছে। অবস্থাও তাদের পরিবারের খুব অস্বচ্ছল নয় বলেই মনে হয়।

জীমূতের বিচারে যদি ভুল না থাকে তাহলে নির্মলার এখনো অবিবাহিত থাকাটা কিন্তু বেশ অস্বাভাবিক। এমন মেয়ের বিয়ে এখনো হয়নি কেন? বাধা কোথায়? নির্মলা রায় কি নিজেই বিয়ে করতে চায় না? কেন? তার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গোপন রহস্য আছে এর পেছনে?

তা যদি থাকে জীমূতের তা জানবার কোনো উপায় নেই। অধিকারই কি আছে?

তবে চিঠিগুলোর সুর থেকে গোপন রহস্যটা কোনো গভীর বেদনা বা শোকের বলে মনে হয় না।

না, ভুল করছে এখানে। গভীর বেদনা ঢাকা দেবার জন্যেই ত এমনি হাল্কা আবরণ টানা হতে পারে।

আর এবারের চিঠির সুরটাকে ঠিক হাল্কা কি বলা যায়! একটা চাপা অস্থিরতা কি সমস্ত এলোমেলো উচ্ছ্বাসের ভেতর দিয়ে ফুটে বার হচ্ছে না।

কিসের সে অস্থিরতা? তাকে চিঠি লেখবার জন্যেই বা এমন প্রায় আকুল অনুরোধ কেন?

সত্যি কি হয়েছিল নির্মলার যে দুমাস একটা চিঠিও লেখেনি?

কোথাও যে গিয়েছিল তেমন কোনো আভাসও ত চিঠিতে নেই।

অনেক প্রশ্ন। অনেক সংশয় বিস্ময়!

অস্থির হয়ে লাভ নেই। পাবার যদি হয় ত উত্তর সে পাবে। এখন শুধু যোগাযোগের সূত্রটুকু বেশী টান বা বেশী ঢিলে হতে দিয়ে অচল না করে ফেলা।

নির্মলাদেবী,

সত্যি খুব ভাবিয়ে দিয়েছিলেন। একেবারে দু মাসের ওপর কোনো সাড়া না পেয়ে ভয় হচ্ছিল যে আপনার খেয়াল বুঝি বদলে গেছে কিংবা একজন নতুন লেখকের জন্যে আর সময় নষ্ট করা উচিত মনে করেন নি। দু মাস ধরে চিঠি না পেয়েও আমি কেন নিজে থেকে চিঠি লিখিনি, অভিযোগের সুরে জিজ্ঞাসা করেছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখুন দিকি, আমার পক্ষে সেটা ধৃষ্টতার সামিল হত না? নিজের মান মর্যাদার কথা বলছি না, কারণ কাগজে দুটো লেখা ছাপা হয়ে কিই বা মান মর্যাদা আমার হয়েছে। কিন্তু অপরিচিতা একজন মহিলা অনুগ্রহ করে পাঠিকা হিসেবে আমায় কয়েকটা চিঠি লেখার পর হঠাৎ নিজেই যদি নীরব হয়ে যান তখন তাঁকে খুঁচিয়ে বিরক্ত করবার অধিকার কি আমার আছে? আমি সামান্য একজন নেহাৎ নতুন লেখকের বেশী কিছু যে নই এ কথাটা

আমি ভুলি না। আপনি ইচ্ছে করেই চিঠি লেখা বন্ধ করেছেন মনে ভেবে দুঃখ পেয়েছিলাম সত্যিই। কিন্তু প্রতিকারহীন সে দুঃখ মেনেই নিয়েছিলাম বাধ্য হয়ে।

তারপর আপনার এই চিঠি পাওয়াটা কি সৌভাগ্যের আনন্দ যে এনে দিয়েছে তা লিখে বোঝাতে পারব না! আপনার তাহলে আমাকে চিঠি লেখায় এখনো অরুচি ধরেনি। আপনি নিজে থেকে আমায় চিঠি লেখবার তাগিদও দিয়েছেন!

এ অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যে আমি যদি কোথাও বেফাঁস কিছু লিখে ফেলি ক্ষমা করবেন ত?

একটা বেয়াদবীর পরীক্ষা এখানেই করিয়ে নিচ্ছি।

সত্যি দু মাস ধরে আপনি চুপ হয়ে গিয়েছিলেন কেন বলুন ত! উপায় ছিল না লিখেছেন। নিরুপায়টা কোন দিক দিয়ে?

দোহাই আপনার উত্তর না দিতে চান দেবেন না। বকুনি দিতে চান কড়া করে দিন। কিন্তু আবার দু মাস ধরে নীরব হয়ে যাবেন না ত?

উদ্বিগ্ন

জীমূত

ও, জীমূতবাহন মল্লিক মশাই।

আমার একটা প্রশ্নের আগে জবাব দিন ত?

সত্যি বয়স আপনার কত? আপনি কি একেবারে ছেলে-ছোকরা? মানে কুড়ি বাইশের কাছাকাছি? কুড়ি বাইশে জবর কিছু লিখে ফেলা ত অসম্ভব কিছু নয়। কারুর কারুর প্রতিভা ওই বয়সেই একেবারে পুরোপুরি ফুটে ওঠে।

সুতরাং লজ্জা না করে বয়সটা জানাবেন ত?

সত্যিই কুড়ি বাইশ হলে আমি অবাক যেমন হব তেমনি একটু অপ্রস্তুতও। আপনাকে যে সব চিঠি লিখেছি সেগুলো নেহাৎ কচি কাঁচা ভেবে ত নয়। একটু পরিণত বয়সের মর্যাদাটা তাতে আপনাকে দিয়েছি। কুড়ি বাইশ জানলে চিঠির সুর একটু আলাদা হত। সত্যি কথা বলতে

গেলে একটু বাৎসল্যের ভাব তা থেকে বাদ দিতে পারতাম না।
আমার সত্যিকার বয়সটা আপনাকে জানিয়ে দেওয়াটা এখানে দরকার। নাম করা প্রসূতি সদনটার রেজিস্টারে কারচুপি না করলে বয়সটা আটাশের নিচে নামানো যাবে না। আপনাকে এখন আপনি বলা ঠিক হবে ত?

নির্মলা

নির্মলাদেবী,

আপনি বলা বেঠিক হবে না। আর বাৎসল্য ভাবের কোনো সুযোগ আপনার নেই। আমি তেত্রিশ পার হয়েছি দু মাস হ'ল!
আপনাকেই বরঞ্চ 'আপনি'-ত্ব থেকে নামিয়ে দিতে পারি। বুঝেছেন?

জীমূত

জীমূতবাবু,

তাই দিন না, জীমূতবাবু। না, দিতেই হবে আপনাকে। এরপর তুমি না লিখলে চিঠি খুলেই আর পড়ব না।
হ্যাঁ আর একটা অনুরোধ রাখবেন? একটা ফটো পাঠাবেন আপনার?
না, না। খুব ভুল লিখে ফেলেছি। আপনার ছবিটবি কিছুই আমি চাই না। কখনো পাঠাবেন না।
পত্র-পত্রিকায় আজকাল লেখকদের ছবি দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। কিছু দিন বাদে আপনার কাছেও হয়ত চাইবে। কিছুতেই ছবি দেবেন না। দিয়ে সস্তা হবেন না। খুব পীড়াপীড়ি করলে বলবেন, নিষেধ আছে।
কার নিষেধ? কার নিষেধ? যার হোক একটা নাম করে দেবেন। সব চেয়ে ভালো বোধহয় জ্যোতিষীর মানা আছে বলা। বলবেন, আপনার কুষ্ঠি দেখে একজন জ্যোতিষী বলেছে, কোনো প্রতিকৃতি কখনো কোথাও যেন মুদ্রিত না হয়। হলেই প্রভূত অনিষ্ট। শনির সঙ্গে বুধ বক্রি গোছের কিছু হয়ে যাবে।
আপনি জ্যোতিষ মানেন?
আমি খুব মানি। দু মাস ছ মাস করে পরপর অনেক জ্যোতিষীকে মানি।

আমার কোষ্ঠীপত্র নেই। বাবা দারুণ নাস্তিক ছিলেন। ওসব কিছুতে বিশ্বাস করতেন না। আমার কোষ্ঠীটোষ্ঠী করান নি আদবেই।

বাবা ত আর নেই! এখন আমার আফশোষ কেন আমার কোষ্ঠী করানো হয়নি। অন্ততঃ জন্মক্ষণটাও ঠিক মত লেখা থাকলে ত হত।

তাও নাকি নেই! সে অভাব পূরণ করবার জন্যে আমি হাত দেখাই। পেশাদার জ্যোতিষীদের নয়। যাকে বলা যায় ভ্রাম্যমান সাধু জ্যোতিষীদের।

এসব সাধু জ্যোতিষীরা শহরে শহরে রাস্তায় ঘাটে ঘুরে বেড়ান তাঁদের আশ্চর্য ক্ষমতা দিয়ে মানুষের উপকার করার জন্যে। এঁদের মধ্যে বোধহয় খবর চালাচালির কোনরকম একটা অদৃশ্য বেতার ব্যবস্থা আছে। একজন এসে ধন্য করে যাবার মাসখানেকের মধ্যেই আরেকজনকে এই রাস্তাতেই যেতে আসতে দেখা যায়।

আমার সহচরী মানদার ওপর হুকুম ছিল এরকম সাধু দেখলেই যেন ডাকে।

ডাকতে ভুল হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই। কারণ শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিজেরাই এসে দরজার কড়া নাড়েন। খোঁজ নিতে যে নামে তাকে আদেশ করেন দিদিমণি বা বহীনজিকে খবর দিতে যে হৃষিকেশ কি নৈমিষারণ্য থেকে সাধুজি এসেছেন।

আর তাঁকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। মানদা তাঁকে পথ দেখিয়ে আমার ঘরে নিয়ে আসে।

এই আগেরবার যিনি এসেছিলেন তিনি এসেছিলেন নৈমিষারণ্য থেকে। খবর দিতে বলেছিলেন বহীনজিকে নয়, দিদিমণিকে।

আমার ঘরে ঢুকে দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন,—তুই আমায় ডাকছিলি। তাই আসতে হ'ল।

এঁরা সবাইকে তুই তোকারী করেন। তুই তোকারী না করলে এঁদের গণনা মেলে না।

নৈমিষারণ্যের সাধুজি আমার হাত পর্যন্ত দেখতে চান নি। এমনি মুখের

দিকে চেয়েই যা জানবার সব জেনে ফেলে বলেছিলেন,—যাঃ তোর সব বালাই মুছে দিলাম। তুই রাজরাণী হবি।

মানদা আর চুপ করে থাকতে পারে নি। আঁচল মুখে দিয়ে হাসিটা চেপে বলেছিল, দিদিমণি রাজরাণী হবে কি? ও ত সত্যিই রাজরাণী!

একটু করুণার হাসি হেসে নৈমিষারণ্য সাধুজি বলেছিলেন, আমার কথা তুই বুঝবি না। তোর দিদিমণি বুঝেছে।

আমি ভক্তিভরে সে কথা স্বীকার করেছি। আর হাওয়াই জাহাজগুলোর উৎপাতে শূন্যমার্গে যাওয়ার অসুবিধার দরুণ সাধুজি শুধু নৈমিষারণ্যের ট্রেন ভাড়াটুকু নিয়ে চলে যাবার পর থেকে আমার কাছে অন্য সাধুদের ডাকা বন্ধই করে দিয়েছি একেবারে।

পাছে আমার রাজরাণী হওয়ার গণনাটা পরের কারুর বিচারে বদলে যায়, এই আমার ভয়।

এরকম বদলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আগেই হয়েছে কি না!

সেই হৃষিকেশের সাধুজির কথা ত ভুলতে পারি না। তার আগের সাধু বাবার গণনার জোরে আমি দুনিয়ার সব তীর্থ দর্শনের জন্যে তৈরী হচ্ছিলাম।

কিন্তু হৃষিকেশের সাধুজি ঘরে ঢুকেই আমার ভুল ভেঙে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

বলেছিলেন,—তু ত বেটী ঠগকা কবলা হুয়ী।

তারপর আমায় বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে আগের সাধুবাবা ছিল একেবারে পাক্কা ফেরেববাজ। সে জ্যোতিষের কিছুই জানে না। শুধু ঝুট সব আশা দিয়ে ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে যায়। আসলে আমার পেছনে এক দুষমণ ছায়া আছে। সেই আমার কিছু ভালো হতে দিচ্ছে না। তাকে হটাবার জন্যে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাগ করতে হবে।

সাধুজি তাই করবার নামমাত্র খরচ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর যাগ নিশ্চয়ই সফল হয়েছে। আমার রাজরাণী হওয়ার কপাল তাইতেই খুলেছে হয়ত।

আমি কিন্তু আর এ কপাল ঘষামাজা করতে রাজী নই। তাই অনেক সাধুকে বাড়ির দরজা থেকে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে।

দেখলেন ত! কি কথা থেকে কি কথায় এসে গেলাম? আসলে বাজে বকা আমার একটা রোগ। একবার সুরু করলে আর থামতে পারি না!

রোগটা ইদানীং বুঝি একটু বেড়েছে। অনেক চিঠির তাই উত্তরই আসছে না। কে ধৈর্য ধরে পাতাজোড়া এই সব প্রলাপ পড়বে। আপনার এখনো যে অধৈর্য আসেনি এই ভাগ্যি। হয়ত অনেক দূরে একেবারে পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাংলা কথা কানেও শুনতে পান না বলে, বাংলা অক্ষরগুলো পড়তে খুব খারাপ লাগে না।

ওঃ, আপনার ছবির কথা বলছিলাম না? না, ছবি আপনি কিছুতেই পাঠাবেন না। কোথাও ছাপতেও দেবেন না।

লেখকরা কেন যে তাদের ছবি ছাপাতে দেয়? রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন তাঁর ছবি হিসেবে ছাপবার মত চেহারা ছিল বলে। কৈশোরে যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে বার্ধক্যে সব সময়ে।

তবু অনেক সময়ে মনে হয় তাঁর চেহারাটা কেমন যেন না জানলেই পারতাম। তাঁর অমন সুন্দর চেহারার ছবিও যেন তাঁর রচনার মর্ম বুঝতে বাধা দিচ্ছে বলে মনে হয় এক এক সময়।

আমার ত বিশ্বাস লেখক ভাস্কর বা স্থপতিদের আসল চেহারা থাকে তাদের সৃষ্টির মধ্যে। সেই সৃষ্টির ভেতরে প্রচ্ছন্ন চেহারাটাই আমাদের খুঁজে দেখতে হয়।

বাইরের চেহারাটা ত একটা মিথ্যে খোলস মাত্র। ব্যালজাকের ছবি দেখে আমার ত প্রায় কান্না পেয়েছিল। তাঁর মত স্রষ্টার এই কি সত্যকার চেহারা? কখনো নয়। হ'তে পারে না। ওটা তাঁর ছদ্মরূপ মাত্র।

আপনার চেহারা ছাপা ছবিতে তাই আমি দেখতে চাই না। আপনি হয়ত মোটা, বেঁটে, ঘাড়ে-গর্দানে-আঁটা চেহারার মানুষ। আপনার ফোলা ফোলা মুখে হয়ত বসন্তের দাগ আছে। চুলগুলো আপনার পাৎলা হয়ে এসেছে এর মধ্যেই, বিশেষ করে মাথার মাঝখানে।

কিন্তু তাতে কি হয়েছে ওটা ত আপনার সত্যিকার চেহারা নয়। আপনার সত্যিকার চেহারা দেখেছি যখন ওই গুলবার্গার বাহ্‌মনী রাজ্যের রাজ প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপে আপনি পুরন্দর হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে উন্মাদের মত খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে আপনাদের সমস্ত বিবাহিত জীবনটা গোটানো পটের মত খুলে খুলে বিচার করছেন। কিংবা যখন আপনি মহীতোষ হয়ে বরুণাকে পুরন্দরের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

খুব কি বাজে বকছি ? না বোধহয়।

যাই হোক আপনার একটা ছবি আমার মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। আরো অনেক লেখকেরই এরকম একটা করে ছবি মনের মধ্যে আঁকা হতে পারত! কিন্তু তাদের বাস্তব চেহারা তাতে বাদ সেধেছে। আপনার বেলা তা হতে দিতে চাই না।

চিঠি চাই তাড়াতাড়ি। আর সম্বোধনটা আপনি নয় তুমি।

—নির্মলা

নির্মলা,

আচ্ছা তুমিই বললাম। কিন্তু তুমি বলার পর আর খুব দূরের মানুষ হয়ে থাকা যায় কি ?

তুমি আমার ছবি দেখতে চাও না। আমার ব্যক্তিগত জীবনটা সম্বন্ধে তোমার কৌতূহলও বোধহয় নেই।

কিন্তু আমি যে তোমার ছবি সত্যিই দেখতে চাই। তোমার সব কথা জানবার জন্যে আমার আগ্রহের অন্ত নেই।

আমার ছবি তোমায় পাঠাব না নিশ্চয়ই। কিন্তু তোমার একটা ছবি কি পাঠাতে পারো না।

আর ছবি না পাঠাও তোমার নিজের কথা ত কিছু জানাতে পারো। এই যেমন তোমার বাড়িতে কে কে আছে, তুমি কি করো, সারাদিন কি করে কাটাও ; তুমি যা বিবরণ দিয়েছ তাতে ত বুঝছি চিঠি লেখা তোমার একটা নেশা। এত অজস্র চিঠি লেখবার সময় পাও কি করে ?

আমার এসব কৌতূহল একটু মেটাবে?

এই প্রসঙ্গে তুমি না চাইলেও পুরুষ হিসাবে অভিমানে লেগেছে বলে আমার একটা বিষয় তোমায় না জানিয়ে পারছি না।

তুমি লিখেছ, তোমার কাছে লেখকের বাইরের বাস্তব চেহারার কোনো মূল্য নেই। তার লেখক সত্তার চেহারাই তোমার কাছে আসল।

আমার লেখক-সত্তার চেহারাটা তোমার কাছে কি রকম দাঁড়িয়েছে জানি না। কিন্তু মোটা বেঁটে ঘাড়ে গর্দানে ইত্যাদি যা সব বলে আমার বাইরের চেহারাটা কল্পনা করেছ তার প্রতিবাদ না করে পারছি না।

সুপুরুষ যাকে বলে তা আমি অবশ্যই নই। কোন ফিল্মে নায়ক বলে নির্বাচিত হবার সুদূর সম্ভাবনাও আমার নেই। কিন্তু তাহলেও পিতৃপুরুষদের কল্যাণে চেহারাটা আমার একটু ভদ্রগোছের বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

আগ্রা কানপুরে থাকতে স্কুলে কলেজে হকি টিমে বরাবর খেলে এসেছি। এটুকু বললে যা বোঝায় তার বেশী অবশ্য কিছু দাবী করি না।

নিজের চেহারার বিবরণ দিতে এত ব্যস্ত হলাম দেখে মনে মনে হাসছ?

না, শুধু পুরুষের অভিমানে তোমার ভুল ভাঙবার জন্যে নয়। আমার আসল চেহারার সঙ্গে তোমার মনে আমার লেখক সত্তার যে ছবিটা আঁকা হয়েছে তার মিল বা গরমিল কতটা তা জানবার জন্যেও।

সেটা জানতে চাই আর সেই সঙ্গে তোমার বিষয়ে যা যা প্রশ্ন করেছি তার উত্তরও।

একটা কথা কিন্তু তোমাকে আমি এখনই নিশ্চিৎ করে বলে দিতে পারি। আমি তোমায় যেমন কল্পনা করেছি তার সঙ্গে তোমার সত্যিকার চেহারার বা চরিত্রের বিশেষ কিছু অমিল হবে না। হতে পারে না।

তোমায় কিরকম কল্পনা করি বলেই দি তাহলে।

তুমি পাৎলা রোগা মাঝারিগোছের লম্বা মেয়ে। একটু যেন দুর্বলতার ছাপ আছে তোমার মুখে। যাকে স্নিগ্ধ পাণ্ডুতা বলা যায়। কিন্তু চোখে নয়। চোখ তোমার অত্যন্ত উজ্জ্বল চঞ্চল। চঞ্চল তুমি চলায় ফেরাতেও।

স্থির হয়ে ছ দণ্ড কোথাও বসতে পারো না। তোমার গায়ের রঙ? না, না, গৌর ত নয়ই তবে ময়লা বললেও ভুল হয়। সত্যিকার শ্যামবর্ণ যাকে বলে তুমি তাই।
মিলেছে কি না লিখবে!

জীমূত

জীমূতবাবু,

মেলেনি মেলেনি! একেবারেই মেলেনি।
আপনি ত আপনার কল্পনার নায়িকার বর্ণনা লিখে পাঠিয়েছেন। আপনার ও মানস সুন্দরীর সঙ্গে আমার কোথাও কোনো মিল নেই। তবু ওই কল্পনা নিয়েই আপনি সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ আমার চেহারার সত্যিকার বর্ণনা দিলে আপনি হয়ত চিঠি লেখবার উৎসাহই পাবেন না! ধরুন, আপনাকে যদি জানাই যে আমি তন্বী ত নই-ই রীতিমত স্থূলকায়া ও বেঁটে। এর ওপর আমার রঙটা যদি কঁ্যাটকেটে ফর্সা বলে জানতে পারেন তখন মুখে যাই বলুন মনে মনে বেশ হতাশ কি হবেন না?
তার চেয়ে যা ভাবছেন তাই ভাবুন। আপনার ভুল ভাঙবার চেষ্টা করব না।
আপনার সম্বন্ধে আমার কিন্তু খুব বেশী ভুল হয় নি। আপনার লেখক-সত্তার যে ছবি আমার মনে আমি পেয়েছি তা সিনেমা নায়কের অবশ্য নয়। তার হাতে কিন্তু হকিস্টীকও নেই।
সে চেহারাটা কি রকম ঠিক বর্ণনা করা খুব শক্ত অবশ্য। চেহারার চেয়ে পোষাকটাই যেন আগে চোখে ভেসে উঠছে। এই ধরুন, একটু ঢিলেঢালা গোছের সাজ। একটুও ফিটফাট নয়। ইস্ত্রী ত হয়ই নি। যথা সময়ে ধোবার বাড়িও যায় নি বলে সন্দেহ হয়।
পোষাকের মতই চেহারাটাতেও অযত্ন অবহেলার ছাপ। মাথার চুলগুলো খুব লম্বা না হলেও শুকনো এলোমেলো। দাড়ি গোঁফ খুব পরিপাটি করে কামানো নয়। রুগ্ন নয়, কিন্তু শরীর দেখে হকি খেলোয়াড় হতে পারেন এমন চিন্তাও মাথায় আসে না।

না, আর লিখে দরকার নেই। অনেকটা মিলছে না কি ?

আচ্ছা, চেহারার মিল অমিলের কথা থাক। ওসব কথা লেখালেখি করে লাভ কি ? কোনোদিন চাক্ষুষ দেখাশোনা ত আর হচ্ছে না! যে যার নিজের নিজের কল্পনা নিয়েই তাই থাকা ভালো।

অবশ্য অন্য যা সব জানতে চেয়েছেন সে সব বিষয়েও আপনার কৌতূহল পুরোপুরি মেটাতে পারব বলে মনে হয় না।

আমার বাড়ির কথা, কে সেখানে আছে না আছে, সারাদিন আমি কি করে কাটাই এইসব আপনি জানতে চেয়েছেন।

কেমন করে দিন কাটাই শুনলে কি কিছু বুঝবেন ?

আমি সারাদিন বই পড়ি চিঠি লিখি, জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তার কত কি দেখি। মানদার সঙ্গে মিথ্যে ছুতোয় ঝগড়া বাধিয়ে ওকে ক্ষেপাই। খাই দাই ঘুমোই। এই ত মোটামুটি আমার রুটিন।

বাড়িতে কে কতজন আছে ওসব জানার আপনার দরকার কি ? মনে করুন আমি একরকম একলাই থাকি। হ্যাঁ সত্যিই তাই।

এই আর মাসে দাদা এসে জেদ ধরেছিলেন—আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন।

দাদা বিলেতে ডাক্তারী করেন, সেখানে বিয়ে থা করে বাড়ি করে আছেন, তাঁর ওখানে গেলে আমার যে কোনো অসুবিধা নেই সে কথা বুঝিয়েছেন। দাদার অত বোঝাবার দরকার ছিল না। আমি জানি দাদার ওখানে গিয়ে থাকলে আমি খুব ভালো থাকব। কিন্তু আমি ত শুধু ভালো থাকতে চাই না। আমি এইখানে এই বাড়ির এই বিছানাটিতে থাকতে চাই। এই রাস্তাটাকে দেখতে চাই রোজ শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নিয়ে সব ঋতুর ভেতর দিয়ে। আমায় রাজী করাতে না পেরে দাদা মনে বেশ দুঃখ নিয়েই বিলেতে ফিরে গেছেন। ওই দাদা ছাড়া আমার ত এখন আর কেউ নেই। ওকে দুঃখ দিতে আমি চাই না। কিন্তু উপায় কি আমার ? দাদাকে দুঃখ না দেবার জন্যে আমার বেঁচে থাকার মানেটাত আমি হারিয়ে ফেলতে পারি না।

নিরাপদ নিশ্চিন্ততা যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে এখানেও আমার তা আছে। দাদার কাছে থাকলে আরো বেশী করে তা থাকবে। কিন্তু এখানে যা আমাকে বেঁধে রেখেছে তা ওই নিরাপদ নিশ্চিন্ততা থেকে আরো আলাদা কিছু।

সেটা একরকম অনিশ্চয়তাই বলতে পারি। সব নিরাপদ নিশ্চিন্ততার মাঝে একটা অস্পষ্ট অনিশ্চয়তার ভয়।

জানি, সব আপনার কাছে ধাঁধা লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছেন না। বুঝে আপনার দরকারও নেই।

জানেন আপনার দুটো উপন্যাসই আবার নতুন করে পড়ছি। প্রথমটা পড়ে তারপর দ্বিতীয়টা আরম্ভ করেছি কাল থেকেই।

কেন আপনার লেখা আমার এতটা মনে ধরেছে তাহলে বলেই ফেলি, শুনুন।

আগেই একবার লিখেছি না যে আপনি একটা গল্পই দুটি উপন্যাসে দু'রকম ভাবে সাজিয়ে লিখেছেন। চেহারা চরিত্র আলাদা হলেও আপনার দুটি উপন্যাসের সার কথা একই। দুটি নায়িকার দুভাবে হারিয়ে যাওয়া।

আসলে হারিয়ে যাওয়া ত নয়, হারিয়ে যেতে চাওয়া। প্রথম উপন্যাসের বরুণা আর দ্বিতীয়টির দেবিকা দুজনেই নিজেদের অগোচরে হারিয়ে যেতে চেয়েছে, জীবনের নামে চারিদিকে সাজানো মিথ্যার ঠাট থেকে।

বরুণা সাধারণ অল্প শিক্ষিত গৃহস্থ মেয়ে। স্বামীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে গুলবার্গায় এসেছে। সঙ্গে আছে স্বামীর বন্ধু মহীতোষ। মহীতোষ কাছে থাকলে কি রকম একটা অস্পষ্ট অস্বস্তি বোধ করে বরুণা। তার মনের সেই সব খোপই চাবি বন্ধ করা যেখান থেকে মহীতোষের হৃদয়ের তরঙ্গ তার পক্ষে ধরা সম্ভব ছিল।

তবু অস্পষ্ট দুর্বোধ এক যন্ত্রণায় বরুণা ওই ধ্বংসপ্রাসাদে পুরন্দরের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে গেছে। হারাতে চেয়েছে বলেই হারিয়েছে। এটা হারিয়ে যাওয়ার রূপক।

দেবিকার অন্য ধরণের হারিয়ে যাওয়া। সে সাধারণ সংসার করা মেয়ে নয়। রাজনৈতিক দলের নেত্রী স্থানীয়া। তার জীবন আদর্শের জন্যে অক্লান্ত সংগ্রামের ব্রতে সমর্পিত। সে হঠাৎ হারিয়ে গেছে তার জগৎ থেকে। তাকে কোন দুর্বৃত্তেরাই লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে দলগত আক্রোশে। দেবিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু দেবিকা অপরাধীদের কারু পরিচয় দিতে চায় নি। সব দিক দিয়ে চাপ এসেছে তার ওপর। তার নিজের দলের লোকের, পুলিশের। দেবিকা অটল। ক্রমে সে সব হারিয়েছে। দলের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস সাধারণ মানুষের সহানুভূতি। শেষ পর্যন্ত সে হারিয়েই গেছে বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকায়। হারিয়ে গেছে মানে যেতে চেয়েছে। কেন ?

আমারও কি অমনি হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে ? আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি। আপনার দুটি লেখা তাই কি আমার এত ভালো লেগেছে !

এ হারাতে চেয়ে হারিয়ে যাওয়া মেয়ে আপনি কোথায় দেখেছেন জীমূতবাবু ? কোথায় তা আপনিও ঠিক জানেন কি ?

সংশয়াচ্ছন্না

নির্মলা

এর পর সেই বিমূঢ় বেদনার তিন তিনটি মাস।

জীমূত চিঠি দিয়েছে উত্তর পায় নি। তারপর রেজেষ্ট্রী করা একটা চিঠি ফিরে এসেছে। অ্যাড্রেসী নট ফাউণ্ড।

পাওয়া যাচ্ছে না নির্মলাকে ?

ঠিকানার কি তাহলে ভুল ?

না, ভুল নয় এতটুকু। নির্মলা তাহলে কোথায় ? কি তার হয়েছে ?

তিন মাস বাদে ছোট্ট একটি চিঠি এসেছে অন্য একটা ঠিকানা থেকে।

ঠিকানা পড়ে একটা যন্ত্রণা-তীক্ষ্ণ সন্দেহ জেগেছে জীমূতের মনে। সে সন্দেহ হয়েছে চিঠিটা পড়েও।

জীমূতবাবু,

অনেকদিন বাদে চিঠি লিখছি। আপনি হয়ত এর মধ্যে চিঠি দিয়েছেন। আর উত্তর না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ছেঁটেই ফেলেছেন মন থেকে। চিঠি কিন্তু এখন থেকে আশা করি পাবেন। রাগ করে থাকবেন না। উত্তর দেবেন। ইতি—

নির্মলা

নির্মলা,

তুমি যথাসাধ্য চেপে রাখতে চাইলেও তোমার ঠিকানাটা পড়ে মনে হচ্ছে এটা একটা নার্সিংহোম।

তার মানে গত তিন মাস ধরে তুমি অসুস্থ। বাড়িটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছ। নির্মলা, আমি কলকাতায় যাচ্ছি। হারিয়ে যাওয়া আমার সেই নায়িকাকে আমি খুঁজে পেতে চাই। ইতি—

জীমূত

জীমূত,

না, না, ওগো না। তোমায় মিনতি করি তুমি এসো না। শোনো তোমায় সব কথা খুলে বলছি।

অনেকদিন আগে রাস্তায় এক মোটর দুর্ঘটনায় আমার দু পা পঙ্গু হয়ে গেছে। সারাক্ষণ আমায় শুয়েই থাকতে হয়। আমার বাবার কথা একবার বোধহয় তোমায় লিখেছি। তিনি তাঁর পঙ্গু মেয়ের যথাসাধ্য সুব্যবস্থাই করে গেছেন। আমার চিকিৎসা সেবা-শুশ্রূষা ভরণ-পোষণের ত্রুটি হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু···

কিন্তু ধীরে ধীরে আমার দুই পায়ের পঙ্গুতা শরীরের ওপর দিকে এগিয়ে আসছে। তাই এর আগে দু মাস আমি নীরব হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেবারে আমার বাড়ি থেকেই চিকিৎসা সম্ভব হয়েছিল। এবারে আর তা নয়। যেখানে এসেছি সেই নার্সিংহোমেই যে কদিন বাঁচি আমায় কাটাতে হবে।

আমার শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ কঙ্কাল হয়ে যাবে। দেখলে তোমার ভয় হবে,

হয় ত ঘৃণাও।

এ চেহারা তোমায় আমি দেখাতে চাই না, চাই না।

জীমূত, তুমি এসো না, এসো না। আমি একটা স্বপ্ন হয়ে তোমার মনে থাকতে চাই।

জীমূত তুমি এসো না। ইতি—

তোমার

নির্মলা

জীমূত এ চিঠি পায়নি।

এ চিঠি যখন এসেছে তখন সে কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেছে।

২

একবার দুবার নয়, অন্তত পাঁচবার ফিরে ফিরে জায়গাটা পড়েছে লোকেশ। বারদুয়েক পড়বার পর কাগজটা টেবিলের পাশে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে আবার কিসে যেন চঞ্চল হয়ে উঠে কাগজটা তুলে নিয়ে আবার সেই পাতাটা খুলেছে এবং অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আরও বারতিনেক পড়বার মধ্যে মাঝে মাঝে থেমে সামনের দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভেবেছে।

ঘরে কেউ নেই। থাকলে লোকেশের কোঁচকানো ভুরুর সঙ্গে মুখের ঈষৎ ভাঁজের দুর্বোধ্য রেখাগুলোও দেখতে পেত। দেখে কিছু বুঝত কিনা সন্দেহ। রেখাগুলো বিরক্তির নয়, আবার ঠিক প্রসন্ন মনোযোগেরও বলা যায় না। কৌতূহলের সামান্য আভাসের সঙ্গে বিষাদের ছায়া যেন তাতে লেগে আছে।

যতটুকুই হোক লোকেশকে এমনভাবে বিচলিত করবার মত কি আছে খবরের কাগজটার বিশেষ একটি পাতায়?

কোন বিশেষ খবর? না। খবর নয়, শুধু একটি বিজ্ঞাপন। তাও এক কলমের মাত্র পাঁচ-ছয় লাইনের।

এ বিজ্ঞাপন লোকেশের চোখে পড়বারই কথা নয়। খবরের কাগজ খুলে খুঁটিয়ে বিজ্ঞাপন পড়ার অভ্যাস তার নেই। বিশেষ করে ক্ষুদে ক্ষুদে বিজ্ঞাপনে ঠাসা কাগজের দ্বিতীয় পাতাটার তলায় একবার চোখ বুলিয়েই সে পাতাটা উল্টে যায়। আজ তাই করতে গিয়েই চোখটা আটকে গিয়েছিল ছোট্ট বিজ্ঞাপনটায়। আটকে গিয়েছিল শুধু কি ছোট পাইকা হরফের শিরোনামটুকুর জন্যে?

না বোধহয়। বিজ্ঞাপনটা ঠিক ওই জায়গায় না থাকলে দৃষ্টিই পড়ত না তার ওপর! শিরোনামটা তাহলে আর কি করে লক্ষ্য করত?

বিজ্ঞাপনটা ওই জায়গায় ছাপা হওয়াই তার চোখে পড়ার কারণ। স্বনামধন্য বাংলা সংবাদপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তলাকার কমিক স্ট্রিপটির ওপর প্রতিদিন একবার চোখ বোলানো তার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে।

বিজ্ঞাপনটি ঠিক তার ওপরের একটি কলমেই ছাপা। তাই কমিক ছবি থেকে চোখ তুলতে গিয়ে আপনা থেকেই নজরে পড়ে গেছে।

শিরোনামটাই তখন অবশ্য দৃষ্টিটা ধরে রেখেছে।

শিরোনামটা অদ্ভুত কিছু তা বলে নয়, শুধু একটু যেন খাপছাড়া।

জলের দামে—হেডিং শুধু এই দুটি শব্দের। তার নিচের চার-পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপনটি কোন একটি সম্পত্তি বিক্রয়ের। কিন্তু সম্পত্তি-বাড়ি-জমির নিজস্ব সারির বদলে সেটি অন্যত্র আলাদা ছাপা হয়েছে।

বে-জায়গায় যেমন ছাপা হয়েছে, বিজ্ঞাপনের ভাষাটাও তেমনি একটু আলাদা। 'সম্পত্তি-বাড়ি-জমি'র সাধারণ বিজ্ঞাপন এ ভাবে লেখা হয় না। 'জলের দামে' শিরোনামায় নিচের লাইনগুলি হল,—তেইশ পল্লীতে তিন কাঠা জমির উপরে পুরোনো দোতলা বাড়ি। মালিক বিদেশগামী বলিয়া অর্ধেক মূল্যে অবিলম্বে বিক্রয়। যোগাযোগ করুন—ডি, রায়। ফোন নং ২৪৮৮০০।

শুধু এইটুকু ছাড়া আর কিছু নয়।

তেইশ পল্লী দেখে প্রথম কৌতূহলটা একটু জেগেছিল তারপর তিন কাঠা জমির পুরোনো দোতলা বাড়ির কথা পেয়ে বিজ্ঞাপনটা আর একবার পড়ে সরিয়ে রেখেছিল কাগজটা। তারপরেই হঠাৎ যেন মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে সংক্ষিপ্ত নামটা। ডি. রায়! ডি. রায় মানে কি।

ফোন নম্বরটা থেকে কোন সাহায্য অবশ্য পায়নি। নম্বরটা দেখে বোঝা যাচ্ছে ফোনটা স্পষ্টতই মধ্য কলকাতার। তেইশ পল্লীর অন্তত নয়। হয়তো কেন নিশ্চয়ই রায়ের অফিসের ফোন নম্বর।

কিন্তু ডি. রায় নামটা যে মনটাকে বিশ্রীভাবে নাড়া দিচ্ছে।

বিজ্ঞাপনটা আবার ফিরে ফিরে পড়তে হয়েছে তাই।

কোন খেই যদি তা থেকে পাওয়া যায়! তা গেছে কি?

তেইশ পল্লী, তিন কাঠার ওপর পুরোনো বাড়ি আর ডি. রায়, একসঙ্গে মেলালে স্পষ্ট একটা কিছু কি দাঁড়ায়?

তেইশ পল্লী তো আর নেহাৎ ছোটখাটো জায়গা নয়। কাঠা তিনেকের পুরোনো দোতলা বাড়িও সেখানে অমন কতই তো থাকতে পারে। আর ডি. রায় নামটা। এটার মধ্যে কোন খেই আছে মনে করা তো তার নিছক কল্পনা।

একমাত্র ইঙ্গিত যা আছে মনে করছে তা ওই 'ডি' অক্ষরটাতে। সে ইঙ্গিত আবার কেটে যাচ্ছে ওই মালিক বিদেশগামী কথাটায়।

মালিক কেন? বিদেশগামীই বা কেন?

ওটা কি শুধু ব্যাকরণকে উপেক্ষা? কিন্তু শুধু শুধু ও-রকম উপেক্ষা করতে যাবেই বা কেন? বাংলা জ্ঞান তার কম এমন তো নয়। নিজের যথার্থ পরিচয় জানাবার আগ্রহ না থাক লুকোবার দুর্বলতাও তার নিশ্চয় নেই।

সে রকম দুর্বলতা যদি হয়ে থাকে তাহলে ব্যাপারটা নতুন।

কিন্তু এত কথা ভাববার কোনো ভিত্তি আছে কি?

সব কিছু তো নির্ভর করছে ওই 'ডি' বলতে কি বোঝায় তার ওপর।

'ডি' মানে সে যা ভাবছে তা যদি না হয় তাহলে সব জল্পনা কল্পনাই তো মিথ্যে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? মালিক বিদেশগামী বলায় ব্যাকরণ লঙ্ঘন যদি হয়েও থাকে তবু আরও অনেক কিছুতেই তার পরিচয় ধরা পড়ছে নাকি?

বিজ্ঞাপনের ধরণটাতেই তো তার নিজস্ব ছাপ।

'জলের দরে' বলে বিজ্ঞাপন শুরু করবার মধ্যেই যেন স্পর্শটা স্পষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

তার ওপর তেইশ পল্লীর তিন কাঠা জমির পুরোনো দোতালা বাড়ি—সত্যি সত্যি এটা কি নেহাত অসাধারণ ব্যাপার? তেইশ পল্লীতে ও-রকম

তিন কাঠার পুরোনো দোতলা বাড়ি আখছার পাওয়া যায়।

বিশ্বাস হয় না। তাহলে কি বিশ্বাস করবে? মন তার যা বিশ্বাস করতে চাইছে সেটাই কি সত্য হওয়া সম্ভব?

তিন কাঠার পুরোনো দোতলা বাড়ি মানে সেই একটিমাত্র জায়গা, যেখানকার মাটি ইঁট কাঠ থেকে সবকিছুতে তার হৃদয়ের ছাপ এখনও লেগে আছে?

আর, 'ডি' মানে···? চায়ের পেয়ালায় আর চুমুক দেওয়া হয়নি। সেটা টেবিলের একধারে সরিয়ে রেখে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকেছে লোকেশ।

কি করবে তাই স্থির করবার জন্যে কি!

না, তা নয়, যা ভেবেছে তা সত্য হলে জীবনটা আবার কোন্ দুঃসহ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাবে সেইটে একবার ভাল করে বুঝে নেবার জন্যে।

বাইরে লোকেশ তখন পাথরের মূর্তির মত স্থির নিষ্পন্দ, কিন্তু মুখে তার একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে। সেই হাসি নিয়েই সে ফোনটার কাছে উঠে গেছে। তারপর ধীরে ডায়াল করেছে নম্বরগুলো।

পুরো ডায়াল করতে হয়নি। প্রথম দুটো সংখ্যার পরই এনগেজ্‌ড পেয়েছে! তার মানে এক্সচেঞ্জটাই আপাতত অচল।

এটা কি তার ভাগ্যদেবতার হুঁশিয়ারী!

সে হুঁশিয়ারী মানবার হলে লোকেশ এসে ফোনে বসত না।

একবার দু'বার তিনবার বিফল হয়েছে। তবু লোকেশ থামেনি।

একটু শুধু বেশি করে ফাঁক দিয়েছে পরপর ডায়াল করার মধ্যে।

সেই ফাঁকের অবসরে ভেবেছে অবশ্য অনেক কিছু। 'ডি' মানে সে যা ভেবেছে তাই না হয় হল। তাকে না হয় পাওয়াও গেল ফোনের অপর প্রান্তে।

তারপর? তারপরে প্রথম সম্ভাষণ কি করবে লোকেশ?

গলাটা ঠিকই নিশ্চয় চিনতে পারবে। মাত্র তো পাঁচবছর কেটেছে। পাঁচবছরে গলায় রোগ-টোগ কিছু না হলে গলার স্বর বদলাবার নয়।

কিন্তু স্বর না বদলাক, তাতে সুর কি থাকবে?

বিস্ময়, উদাসীনতা, বিরাগ, ঘৃণা, কিসের?

নামটা বললেও না চেনবার ভান করবে কি?

লোকেশও তো তা করতে পারে? ফোন করছে নেহাৎ ব্যবসাগত প্রয়োজনে। বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন পড়ে একজন ক্রেতা উৎসাহী হয়েছে।

ক্রেতার গলা কি চিনে ফেলবে সে? না-ও তো চিনতে পারে?

নেহাৎ নিরুত্তাপ ব্যবসায়িক কণ্ঠেই যদি সে আলাপ শুরু করে তখন।

ফোনটা ছ'বারের চেষ্টায় হঠাৎ এবার রিং করতে শুরু করেছে স্বাভাবিক ভাবে। কেউ কিন্তু ধরছে না।

নম্বরটা ঠিকই তো ডায়াল করেছে। কেউ এখন তবে ওখানে নেই নাকি? বিজ্ঞাপনে সময় তো কিছু দেওয়া নেই, তবু নম্বরটা যখন অফিস পাড়ায় তখন এরকম সময়ে কেউ না থাকতেও পারে। খানিক বেজে যাক তবু। বেশ কিছুক্ষণ গেলেও কেউ যদি না ধরে তাহলে ছেড়ে দেবে। ছেড়ে দেবে ভাবার সঙ্গে একটা নিষ্কৃতির বোধ কি মনের মধ্যে একটু শান্তির আভাস আনে?

না, তার বদলে একটা যন্ত্রণাই যেন বুক থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যায়। একটা পুরোনো ক্ষতের ওপরকার নরম চামড়া কে যেন নতুন করে ছিঁড়ে দিয়েছে।

সে যন্ত্রণাটা যে অনুমান নয় তা ফোনটা হঠাৎ একজন এসে ধরতেই বুঝতে পারল লোকেশ।

যে ধরেছে সে ডি. রায় কোন মতেই নয়। অন্য কেউ।

হ্যালো, কাকে চাই—ভারি যান্ত্রিক গলা।

আমি ডি. রায়কে চাইছি। তিনি আছেন?

না। নেই।

কখন তাঁকে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

আজ কোন সময়ই পাবেন না। ওদিকে ফোনটা নামাবার জন্যেই যেন

ব্যস্ততা দেখা যায়।

মানে আজ তিনি আসবেন না?—কোনরকমে কথাটা চালিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হয় লোকেশকে।

না। ওদিকের গলা সংক্ষিপ্ত—কাল ফোন করবেন।

কোন্ সময়ে করব বলবেন একটু? লোকেশ বিনীত।

এই সময়েই করবেন।

ফোনটা ঘটাং করে নামিয়ে রাখবার শব্দ পাওয়া গেল।

এরপর আজকের মত আর কিছু করবার নেই।

কাল আবার এই সময়ে ফোন করলে ডি. রায়কে পাওয়া যেতে পারে। কালও পাওয়া যাবে কি? আর কালও ঠিক সময় ধরে ফোন করবে কি লোকেশ?

এখন ভেবে লাভ নেই, কাল অনেক দূর। তার মধ্যে অনেক কিছু হতে পারে। আশ্চর্য সব ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে তাদের জগতে।

একবার যেমন গিয়েছিল? কবে?

তারিখটাও বলে দিতে পারে লোকেশ নির্ভুলভাবে। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

এখন কি করতে পারে? তৈরি হয়ে নিয়ে যথাসময়ে কাজে বার হবে? হবে না-ই বা কেন?

লোকেশ উঠে গিয়ে দাড়ি কামাতে বসে। মনোহর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে কামাবার গরম জল রেখে পেয়ালা নিয়ে যেতে গিয়ে একটু অবাক হয়। সাহেব আজ চা দু-এক চুমুকের বেশি মুখে দেননি। বিস্কুটের প্লেটটা যেমন ছিল তেমনিই পড়ে রয়েছে। দাড়ি কামাতেও বসেছেন তাড়াতাড়ি।

এরকম ভুল তার সাহেবের মাঝে মাঝে অবশ্য হয়। সব তাঁর একেবারে মাপাজোখা নয়। তা না হোক, অন্য দিক দিয়ে বেশি ঝামেলা করেন না, খুঁত ধরেন না প্রতি কাজে। মনোহর পেয়ালাটা নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

লোকেশ তখনও আয়নার সামনে বসে। ব্রাসটা সাবানের বাটিতে পর্যন্ত ঠেকায়নি! ফোনের কথাবার্তাগুলো আবার ভাবছে।

তার কি ভুল হয়েছে আলাপ চালাবার ধরণটায়?

অন্যভাবে কথা বলে আসল খবর কিছু কি জেনে নিতে পারত লোকেশ? কে ডি. রায়, কেমন, কোন্ বাড়ি—এই সব খবরগুলো অন্তত জানবার চেষ্টা করতে পারত না কি?

কেন করেনি তাহলে?

কেন করেনি লোকেশ মনে মনে খুব ভাল করেই জানে। চেষ্টা করেনি। সত্য কথাটা কি হবে সে বিষয়ে মনের মধ্যে দ্বিধা সংশয় ভয় ছিল বলে। যে মুহূর্তে ফোনে অপরিচিত গলা শুনেছে, অমনি নিজের অজান্তে গুটিয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে।

জানবার যদি কিছু থাকে তাহলে এই অচেনা একজনের গলা থেকে জানতে চায় না। আঘাত যদি কিছু আসবার হয় তাহলে যথাস্থান থেকেই আসুক।

তাই জন্যেই ফোনের আলাপটাকে ওই একটা যান্ত্রিক স্তরেই রেখে দিয়েছে।

ওই যান্ত্রিক আলাপেই কিছু তবু ধরতে পেরেছে কি? একটু কোন আভাস?

আভাস, চেষ্টা করলে একটু পাওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু যা পাওয়া যায় তা তো খুব প্রীতিকর বলা যায় না।

ফোন যে ধরেছিল তার কণ্ঠে প্রসন্নতার বেশ অভাব। ডি. রায় নামটা যারই হোক তার সম্বন্ধে তেমন একটা ভক্তি সম্ভ্রমের পরিচয়ও সে কণ্ঠে পাওয়া যায় নি।

ডি. রায় বলতে লোকেশের মনে যে ছবি ফুটে উঠছে তাই সত্য হলে ফোনের কণ্ঠকে আর একটু মসৃণ করে দিত না কি? এক মাত্র হতে পারে যে আজ ফোন যে ধরেছিল সে বাইরের কেউ। ডি. রায়কে হয়তো ভাল করে জানেই না।

এ যুক্তিতেও মনের মধ্যে খুঁত থেকে যায়। কোথায় যেন একটা গরমিল খোঁচা দিতে থাকে। নিজেকে একটু নাড়া দিয়ে লোকেশ সজাগ করে তুললে এবার।

দাড়ি কামানো স্নান শেষ করে পোশাক পরে নিয়ে খাবার টেবিলে গিয়ে আর বসল না। গাড়ির চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল শুধু, তুমি খেয়ে নিও মনোহর। লাঞ্চ আজ বাইরে খাব।

যে আজ্ঞে! মনোহর আগে আগে গিয়ে গ্যারেজের দরজার তালাটা খুলে দিয়ে কোলাপসিব্‌লটা টেনে দিল। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকেশ। মনোহর কোলাপসিব্‌ল আবার টেনে বন্ধ করে তালা দিয়ে বাসায় ফিরে এল।

সাহেব আজ বাইরে লাঞ্চ খাবেন। সুতরাং তার আর কাজের তাড়া কিছু নেই। সাহেবের এ ধরণের কথায় সে বিস্মিত হয় না। এরকম খেয়াল সাহেবের প্রায়ই হয়। শুধু খেয়ালটার কথা আগে থাকতে জানালে একটু সুবিধে হত মনোহরের। মিছিমিছি সাত সকালে এই রান্নাবান্না-গুলো আর করতে হত না।

কিন্তু আগেই যদি বলবেন তাহলে আর খেয়াল হবে কেন?

কেন সাহেবের এমন খেয়াল মাঝে মাঝে হয়, অতদূর পর্যন্ত অবশ্য মনোহর ভাবে না। ভাবলে কিছু বুঝতে পারত কি? না, পারত না। মনোহরের মনে কবিতার রং থাকলেও ভুল বুঝত।

লোকেশ হঠাৎ বাইরে খাবার সিদ্ধান্তের কথা আগে থাকতে কখনও জানায় না বটে, কিন্তু সেটা তার হাল্কা খেয়াল মোটেই নয়। বাইরে লাঞ্চ খাবে বলে যেদিন সে সকালে বেরিয়ে যায় সেদিন সঙ্গে গেলে একটু অবাকই হতে হ'ত।

লোকেশ উদাসীন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াবার জন্যে অমন হঠাৎ সকাল সকাল বেরিয়ে আসে না। অমন ভাবে যেদিন বেরোয় সেদিন তাকে চরকির মত ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় এক জায়গা থেকে আরেক কাজের জায়গায়।

এমন অনেক জায়গায় যায় যেখানে তার না গেলেও হয়তো চলে, কিন্তু কাজ আর কাজ। লোকেশের সেদিন যেন কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে না দিলে শান্তি নেই।

মস্ত বড় এক কনট্রাক্টর কোম্পানির কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ার। হরেক জায়গায় তাদের হরেক রকম কনস্ট্রাকশন চলছে। সব কিছুর ওপর নজর রাখার দায় লোকেশের। কিন্তু সে দায় মনে করা মানে কাজের চাকায় নিজেকে অমন জম্পেশ করে বাঁধা নয়।

মালিকপক্ষ হয়তো তাতে খুশি হন, কিন্তু বিচক্ষণ যাঁরা তাঁরা একটু ভাবিতও। আতিশয্য ঠিক স্বাভাবিক নয়। সহকর্মীরা নিজেদের প্রকৃতি ও চরিত্র অনুযায়ী কৌতুক অনুভব করেন বা সমালোচনায় মুখর হন। আজ কিন্তু তাঁরাও অবাক হতেন।

কাজের জায়গায় লোকেশকে দেখা যায় না সত্যিই। অনেকক্ষণ উদ্দেশ্য-হীনের মতই মোটর নিয়ে সে এদিক ওদিকে ঘুরে বেড়ায়।

তারপর এক সময়ে তার গাড়িটাকে দক্ষিণ-মুখো হসপিট্যাল রোডে দেখা যায়, সেখান থেকে বাঁয়ে ঘুরে আবার ডাইনেতে বাঁক নিয়ে পি জি হাঁসপাতাল ডাইনে রেখে সোজা দক্ষিণ।

কোথায়? কোথায় যাচ্ছে লোকেশ?

একটা গলি তার পাশে একটা ছোট মাঠ, সেই মাঠের ধারে একটা পুরোনো দোতলা বাড়ি—এখনো আছে কি ঠিক সেইরকম?

থাকবে না কেন? মাত্র তো পাঁচবছর আগেকার কথা।

গলিতে গাড়ি ঢোকে না।

বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে লক্ করে লোকেশ হেঁটেই গলিটায় ঢোকে।

আজ যে এখানে আসবে তা কি সে আগে থাকতেই ঠিক করেছিল?

না, তা করেনি, কিন্তু নিজের অবচেতন মনে সেই সঙ্কল্পটা তখনই বোধ হয় জন্ম নিয়েছে। নইলে সু-র বদলে শুধু স্ট্র্যাপ দেওয়া স্যাণ্ডাল পরে প্যাণ্টটার সঙ্গে টাই না বেঁধে একটা সাদা শার্ট পরে সে বেরিয়ে আসবে কেন?

পোশাকে সে বাড়াবাড়ি করে না কখনও, কিন্তু এ ব্যাপারে সে কেতাদুরস্ত।

খানিকদূর এগিয়ে যাবার পর তাকে একটু দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে কোন কিছু তেমন বদলাবার কথা নয়। সব একরকম ঠিক থাকাই উচিত। কিন্তু তা নেই। গলিটার ধারের সেই মাঠটাই দেখতে পায় না। এমন কি অপেক্ষাকৃত নোতুন কোন্ বাড়িগুলো যে মাঠকে দখল করে তার চেহারা বদলে দিয়েছে তাও ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

তা না পারুক। এই গলি দিয়ে খানিকটা গেলেই ডানদিকের পুরোনো দোতলা বাড়িটার বেলা ভুল হতেই পারে না। ঠিক চিনতে পারবে।

কিন্তু একটু এগিয়ে যাবার পর সে বিষয়েও সন্দেহ জাগে।

বাড়িটা ঠিক গলির ধারে তো নয়। তার সামনে আরেকটা ছোট একতলা বাড়ি যে ছিল। তার পাশ দিয়ে আরেকটা সরু গলি দিয়ে সে বাড়িতে ঢুকতে হত। সেই ছোট বাড়িটাই কি বদলে গেছে?

অনেক বাড়ির সেইরকম চেহারা বদল হয়েছে, দেখছে যে।

বদলাক আর যাই হোক একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই খোঁজ নিশ্চয় পাবে।

জিজ্ঞাসা কাউকে কিন্তু লোকেশ করে না। হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়বার পর যেন সভয়ে গলিটা থেকে পালিয়ে যায়। কিসের ভয়? নিজেও ঠিক বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারবে না লোকেশ।

ভয় কি বাড়িটায় অন্য কিছু দেখবার? বিক্রীর জন্যে যার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সেটা আলাদা কোন বাড়ি—এইটেই জানতে হতে পারে বলে আতঙ্ক?

না, হঠাৎ সেই বন্ধ করে মুড়ে ফেলা পাতা আবার খোলা সম্বন্ধেই সাহসের অভাব?

লক খুলে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে চালাবার পর স্টীয়ারিং হুইল হাতে ধরে খানিকক্ষণ মনটাকে সে একেবারে অসাড় রাখবার চেষ্টা করে।

না, কোন কিছুই সে ভাবে না! একটু একটু করে মনটাকে যেমন অসাড়-প্রায় করে এনেছিল আবার সেই অবস্থাতেই সে ফিরে যেতে চায়।

হরিশ মুখার্জী হয়ে হাজরা রোড, সেখান থেকে পোল পেরিয়ে আলিপুর। তারপর মাঝেরহাট ব্রীজ পেরিয়ে সোজা ডানদিকে বেঁকে বজবজের রাস্তা।

সেখানে নতুন একটা কারখানায় কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে। এখন একবার যেতে পারে সেখানে। দরকারী কিছু নির্দেশ দেবারও আছে।

কিন্তু লোকেশ হঠাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়। না, কোথাও এখন সে যাবে না। স্কুল পালানো ছেলেমানুষের মত আজ সে সমস্ত কাজে কামাই করবে।

সেই একটা আধা অপরাধ-বোধের সঙ্গে নিয়ম ভাঙার একটা উত্তেজনা আবার ফিরে পাবে কি? তা না পাক, একটা দিন আজ এই ক'বছরের ছক-বাঁধা রুটিন থেকে আলাদা করে রাখবে।

আবার মাঝেরহাট ব্রীজ পেরিয়ে এসে উত্তর-মুখো গিয়ে সে ডাইনে খিদিরপুর ব্রীজ পার হয়ে আবার বাঁদিকে ঘুরে গঙ্গার ধার।

মামুলী নির্জনতা খোঁজার জায়গা।

কিন্তু এখন তাই সই।

সকালের দিক, তাই এ জায়গায় শৌখিন পথচারীদের ভিড় নেই এখন। লোকেশ গাড়িটা রাস্তার ধারে রেখে গঙ্গার ধারে হেঁটে বেড়াবার পথটাতে ধীরে ধীরে নেমে আসে।

বেঞ্চিগুলো এখন প্রায় খালি। একজন দুজন নেহাৎ নিরাশ্রয় হা-ঘরে চেহারার মানুষ এক-আধটা বেঞ্চি দখল করে আছে।

দখল করার ধরণেই তাদের স্বরূপ বোঝা যায়। বেঞ্চিগুলো তাদের হেলান দিয়ে বসার জন্যে নয়; হাত পা এলিয়ে শোবার জন্যে।

সে রকম দু-একটা বাদ দিলে বেছে নিয়ে বসবার যথেষ্ট বেঞ্চি আছে। তারই একটায় লোকেশ গিয়ে বসে।

সামনে গঙ্গা আর সেখানে নোঙর ফেলা একটা রংচটা ঝড়ঝড়ে গোছের

ছোট স্টীমার লক্ষ্য করবার মত। রংচটা স্টীমারটা ওই দু-একটা বেঞ্চিতে শুয়ে থাকা মানুষগুলোর মতই যেন হা-ঘরে।

এককালে এই গঙ্গার ধারে এলে ও-রকম স্টীমার দেখলে মনে কত রকম কল্পনাই না জাগত। সেবারকার কথাটা খুব ভাল করে মনে পড়ছে।

তখনও নদীর ধারে এই প্রমেনেডটা সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি। নানা জায়গায় ভাঙা-চোরা ছিল। এ রাস্তা দিয়ে তাই হাঁটেনি। গ্যাংওয়ে দিয়ে কাঠের জেটিটার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল খানিকক্ষণ।

এমনি একটি জাহাজ ছিল জেটি থেকে কিছু দূরে বাঁ-ধারে নোঙর ফেলা? চেহারা যা মনে পড়ে তাতে এই জাহাজটাই হতে পারে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়।

কতকাল হয়ে গেল? অন্তত আট বছর। আট বছর আগে এ জাহাজটারই হয়তো এমন জরাগ্রস্ত চেহারা ছিল না।

কিন্তু ওই হাড়গোড় ভাঙা অথর্ব চেহারাটাই তাদের কথার খোরাক জুগিয়ে ছিল। এই জাহাজগুলো দেখলে মায়া হয়, না? সে বলেছিল।

লোকেশ কোন উত্তর না দিয়ে শুধু তার মুখের দিকে কৌতুক ভরে চেয়ে ছিল।

অমন করে চেয়ে দেখছ কি? খুব যেন বাজে কাঁচা কথা বললাম মনে হচ্ছে?

না তা হবে কেন? লোকেশ হেসেছিল, শুধু দুঃখ হচ্ছে তোমার অমূল্য মায়াটার এই বাজে খরচে। একটা ভাঙা জাহাজের চেয়ে যোগ্য পাত্র কি আর ছিল না?

ঠিক এই কথাটাই কি ওই ভাবে বলেছিল তখন? স্পষ্ট মনে নেই। মনে মানুষের থাকে না। কথাগুলো সময়ের সঙ্গে নিজেদের যেন সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়।

তার পরের আলাপ তো কিছু মাত্র মনে নেই। শুধু বুকের ভেতরকার সেই অস্ফুট যন্ত্রণাটার কথা স্পষ্ট যেন মনে আছে। এখনও, এখনও সেই যন্ত্রণাটা পাঁজরার খাঁজে খাঁজে কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। হঠাৎ এক

সময়ে আচমকা দেখা দিয়ে সমস্ত শরীর মন কিছুক্ষণের জন্যে অসাড় করে দেয়।

সে যন্ত্রণাটা মানসিক নয়, বরং সবটাই যেন শারীরিক, একটা শরীরী উপস্থিতিই সমস্ত সত্তার মধ্যে তীব্র কি যেন পিপাসা তোলে। প্রেমের গল্প তো অনেক পড়েছে। এই অদ্ভুত যন্ত্রণার সঠিক বর্ণনা কোথাও পেয়েছে কি ?

ঠিক মনে করতে পারছে না। যারা এটা অনুভব করে তারা হয়তো জানাতে চায় না বাইরের কাউকে। জানাতে লজ্জা পায় কি ?

না তাও বোধহয় নয়। হয়তো ভাল করে বুঝতেও পারে না নিজেরা।

সেও প্রথম পেরেছিল কি ?

সেই গলি দিয়ে যেতে যেতে বাঁয়ে ছোট মাঠটা ফেলে ডাইনে একটা সরু পথ দিয়ে ক'পা গিয়েই ভেতরে ঢোকার দরজা।

দরজা সারাক্ষণ বন্ধই থাকে ভেতর থেকে। বাইরে থেকে কড়া নাড়তে হয়।

সেই কড়া নাড়াতেই যত লজ্জা আর দ্বিধা।

লজ্জা বা দ্বিধার সত্যিই কিছু কিন্তু ছিল না। ভেতরের অভ্যর্থনাটা সাদর।

কে, বলে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত নেই।

কড়া নাড়বার কয়েক মুহূর্ত বাদেই ওধারের খিল খুলে যাওয়া। আর তারপর বেশীর ভাগ দিনই সেই একই মুখের হাসি আর মন্তব্য—এস ! আমি ঠিকই বুঝেছিলাম, এ লোকেশ।

কি করে বুঝলেন ?

প্রথম প্রথম নয়, কিছুদিন যাবার পর জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়েছিল একদিন।

কি করে আর, কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনেই। হাতের সই-এর মত কড়া-নাড়াও প্রত্যেকের নিজস্ব কি না।

তাই নাকি ? আশ্চর্য হয়ে লোকেশ মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,

আপনি বুঝতে পারেন ?

তখন ভেতরের বারান্দায় তারা পৌঁছে গেছে। এক ধারে রাখা একটি মাত্র পুরোনো বেতের সোফাটাতেই অলক্ষ্য নির্দেশে তখন বসতে হয়েছে লোকেশকে। উত্তরটা তখনই শুনতে পায়নি।

দরজা যিনি খুলে দিয়েছিলেন তিনি সোফার সামনের নড়বড়ে ছোট তক্তাপোষটা থেকে একগাদা ভিজে কাপড় নিয়ে ভেতরে চলে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে।

এত সহজ অভ্যর্থনা সত্বেও একটু আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল লোকেশকে। আড়ষ্ট আর একটু হতাশ।

আজও লিপিকে পাবে না নাকি ?

হরিনাথবাবুর ফিরতে আরো দেরী হবে জানে। তার আসার সময় ঠিক করার মধ্যে নিজের অজান্তে সে-রকম কোন হিসেব থাকে কি না সে বলতে পারে না।

কিন্তু এই সময়টাতে এসে ক'দিন ধরেই সে লিপিকাকে পাচ্ছে না।

লিপিকা কখন আসবে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে কিন্তু একটু সঙ্কোচবোধ হয়েছিল। তার এ বাড়িতে আসা যাওয়ার কারণ কারুরই অগোচর নয়। আসছেও সে খুব কমদিন নয়। তবু একটু দ্বিধা এখনও যেতে চায় না।

জিজ্ঞেস করবার শেষ পর্যন্ত দরকার হয়নি।

ভাবনা কোরো না। আজ লিপি সকাল সকাল আসবে বলে গেছে।

কথাটার সঙ্গে একটু অদ্ভুত হাসি না থাকলে লোকেশ আর একটু সহজ হতে পারত। এ হাসিটার মানে তখন লোকেশ সত্যি বুঝতে পারেনি। এক এক সময়ে হাসিটার মধ্যে যেন একটু বিদ্রূপ আছে বলে সন্দেহ তার হয়নি এমন নয়।

কিন্তু সে সন্দেহ ক্ষণিকের। ব্যবহারে যিনি অমন সহজ স্বাভাবিক, লিপির সঙ্গে তার সম্বন্ধ নিয়ে তাঁর হাসিতে বিদ্রূপের আভাস থাকবে কেন ?

হাসিটা কিন্তু ঠিক সহজ স্বাভাবিক কৌতুকের চেয়ে বেশী কিছুই যেন বোঝাত।

সেটা কি তা নিয়ে অবশ্য সচেতন ভাবে মাথা ঘামায়নি।

কড়া নাড়া শুনেই কে এসেছে আপনি বুঝতে পারেন বলছিলেন না ? নিজের অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে, আগের প্রসঙ্গটা আবার তুলেছিল লোকেশ।

বাঃ, বোঝা শক্ত কিছু নাকি ? তক্তাপোষটার ওপর ক'টা শুকনো শাড়ি ভাঁজ করতে করতে তিনি বলেছিলেন, খুব তো সহজ।

সহজ ! লোকেশ একটু যেন ভেবে নিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ, এক একজনের কড়া নাড়ার একটা ধরণ থাকতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক দিনই সে ধরণ কি এক রকম হয় ? যেমন ধরুন,—খানিকক্ষণ চালাবার মত একটা বিষয় পেয়ে লোকেশ সেটা একটু বিস্তারিত করেছিল, একদিন খুব তাড়ার সময় যে ভাবে কেউ কড়া নাড়ে, অন্য দিন সাধারণ অবস্থায় তা নাড়বে কি ?

কড়া-নাড়া-তত্ত্ব তাহলে রীতিমত একটা গবেষণার বিষয় হতে পারে, কি বল ? শাড়িগুলো ভাঁজ করা শেষ করে ভেতরের ঘরে নিয়ে যেতে যেতে পিছন না ফিরেই তিনি বলেছিলেন, ও বিষয়ে কোন থিসিস্ লেখবার বাসনা না থাকলেও তোমায় বলতে পারি···বাকি কথাগুলো আর ভেতর থেকে শোনা যায়নি।

ফিরে এসে কিন্তু আগের খেই ধরেই শুরু করেছেন, ধরে ধরেই লেখ আর তাড়াহুড়োই কর তোমার লেখার নিজস্ব একটা ধরণ কি বদলাতে পারে ? কড়া-নাড়াও তাই। ওর শব্দটাতেই প্রত্যেকের স্বভাবের স্বাক্ষর থাকে।

হরিবাবুর কি স্বাক্ষর থাকে ? হেসে জিজ্ঞেস করেছিল লোকেশ।

বাবার ? বাবার সব সময়েই যেন দারুণ তাড়া। ওঁর যেন ভয় উনি কড়া নাড়লেও দরজা কেউ খুলবে না।

এটা হরিবাবুর স্বভাবের সঙ্গে মেলে কি ? লোকেশ জিজ্ঞাসা করেছিল।

ওপর থেকে দেখলে মেলে না। কিন্তু ভেতরের মিল নিশ্চয় আছে।

তার মানে হরিবাবুর ভেতরে ওইরকম একটা উদ্বেগ আছে বলে আপনি মনে করেন ? এবার লোকেশের গলায় যথার্থ বিস্ময়ই ফুটে উঠেছিল।

ওটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক কিছু নয়···যেন আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন তিনি,

বাবার মত সারা জীবন যাঁদের যুঝতে হয়, বয়স হলে তাঁদের মনে নিজেরও অগোচরে ওইরকম একটা প্রচ্ছন্ন আতঙ্ক থাকেই। সেটা ছোটখাট নানা কাজে কর্মে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

আপনি তো মনস্তত্ত্ব-বিশারদ মনে হচ্ছে! বেশ একটু মুগ্ধতাই ছিল লোকেশের এবারের হাসিতে, এবার আমারটা বিশ্লেষণ করে বলুন তো?

তোমারটা? কেমন একটু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন তিনি, তোমারটা বলা ঠিক হবে না।

ঠিক হবে না! বিস্ময়ের সঙ্গে একটু ক্ষোভও ফুটে উঠেছিল লোকেশের গলায়, আমার ভেতরে অকথ্য কোন দোষ-টোষ আছে নাকি?

না গো না! হেসে ফেলে তিনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমার কড়া-নাড়ায় আছে একটু যেন ধুকপুকুনি। দেখা হবে কি হবে না সেই ভাবনায় মনের একটু দোলা। একটু চুপ করে আবার তিনি বলেছিলেন, এইবার লিপির কথা জিজ্ঞাসা করতে চাও তো? তা অত লজ্জা করবার তো কিছু নেই!

না না, লজ্জা নয়, মানে—লোকেশকে একটু প্রতিবাদ করতে হয়েছিল।

মানে আমায় বোঝাতে হবে না। যাক—হেসে আবার উঠে ভেতরে যেতে যেতে তিনি বলেছিলেন, দাঁড়াও, আগে তোমার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আসি। লিপি কতক্ষণে আসবে তার তো আর কোন ঠিক নেই।

না না, শুনুন! লোকেশ পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডেকেছিল, আমার চায়ের এখন দরকার নেই।

তোমার না থাক আমার আছে। তিনি ফিরে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন।

কথাগুলো সহজ। কিন্তু গলা অমন হঠাৎ ভারী আর মুখ অমন গম্ভীর কেন বুঝে উঠতে পারেনি লোকেশ। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি—আপনি এ সময়ে চা খান বুঝি! কিছু মনে করবেন না।

না, তা করব না। গাম্ভীর্যটা সরিয়ে মুখে তিনি একটু হাসি এনেছিলেন এখন, কিন্তু আগেকার সে হাসি নয়।

কি অন্যায় অজান্তে সে করে ফেলেছে ভাবতে চেষ্টা করার মধ্যে প্রশ্নটা এসেছিল।

আচ্ছা, তুমি আমায় কিছু বলে ডাকো না কেন?

বেশ একটু বিব্রত বোধ করেই কিছু প্রথমটা বলতে পারেনি লোকেশ। এ বাড়িতে খুব কম দিন সে আসছে না। কিন্তু সত্যিই, এতদিনেও একটা সম্বোধন সে ঠিক করতে পারেনি। কোন রকমে সামনা-সামনি আলাপে দেখুন শুনুন বলে চালায়। ব্যাপারটা একটু বেশ অশোভন বুঝেও ঠিক কি করা উচিত ভেবে পায়নি।

তার সেই সমস্যাটাই এবার সে অকপটে জানিয়েছে। অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করেছে, কি বলে আপনাকে ডাকব?

কেন? সেই আগের হাসিই আবার যেন তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। বলেছেন, নাম ধরে ডাকবে!

নাম ধরে! লোকেশের মুখে বিমূঢ়তা ও বিস্ময় একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

কেন? নাম ধরে ডাকা যায় না? গলার স্বরের সঙ্গে চোখের দৃষ্টির এবার কিন্তু গরমিল। গলার স্বরটায় কৌতুক কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যেন তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা।

লোকেশের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে নিজেই তারপর মীমাংসা করে দিয়েছিলেন, বেশ তাহলে ভাবীই বল।

এ মীমাংসা কিন্তু নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারেনি লোকেশ।

ভাবী বলব! আবার তার সেই বিস্মিত বিহ্বল প্রশ্ন।

হ্যাঁ, ভাবী! কেন, ডাকটা খারাপ?

না খারাপ কেন হবে। এবার লোকেশ একটু বিশদ হতে পেরেছে তার প্রতিবাদে, কিন্তু ওটা তো আমাদের বাংলা ডাক নয়।

তা না-ই হল। হেসে তিনি বলেছেন, আমিও তো তোমাদের মত বাঙালী নই।

বাঙালী নন? লোকেশ সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে।

না। তিনি হেসেছেন, তোমার লিপির দাদা আমায় উত্তরপ্রদেশ থেকে

বিয়ে করে এনেছিলেন।

কিন্তু আপনাকে দেখে বা কথা শুনে তো এতটুকু বোঝা যায় না। লোকেশের সন্দেহটা তখনও যেন সম্পূর্ণ কাটেনি।

বোঝা যাবে কেন? যতদিন ওদেশে কাটিয়েছি তার চেয়ে বেশি কাটালাম তো এ দেশে। বিয়ে যখন হয়েছিল তখন তেরো পার হয়েছি কিনা সন্দেহ।

অত ছোট বয়সে বিয়ে হয়েছিল? লোকেশ নতুন করে যেন তাঁকে লক্ষ্য করছে।

হওয়া আশ্চর্য তো কিছু নয়। তিনি বলেছেন, দেশ আর ভাষা শুধু আলাদা, বিয়ে তো স্বজাতেই হয়েছিল, দুই পরিবার কাছাকাছি থাকার দরুন অন্তরঙ্গতায়। তখন আমাদের জাতে সর্দা আইনকে যতদূর সম্ভব ফাঁকি দেবার চেষ্টাই হত।

সেদিনকার আলাপটা একটু বেশি করে মনে আছে এইজন্যে যে ভাবীজি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নতুন এইসব তথ্যগুলো সেদিনই জেনেছিল। হ্যাঁ, সেই থেকে তিনি ভাবীজি হয়েছিলেন।

সেদিন কিন্তু ও সম্বোধন করতে পারেনি। কেমন যেন জিভে আটকে ছিল।

বিয়ের ব্যাপারটার পর আরও কিছু প্রশ্ন সেদিন করার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তা আর করেনি।

এরপর যে প্রশ্নই করুক ভাবীজির জীবনের আসল ট্রাজিডির একটু ইঙ্গিত তা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। তাই নিজেকে নিরস্ত করেছিল লোকেশ।

ভাবীজি নিজে থেকে না বললে তাঁর অত অল্প বয়সে ভিন্ন প্রদেশ থেকে এ বাড়ির বধূ হবার কথা জানতেই পারত না। এ বাড়িতে ওসব কথা কোন সময়ে আলোচনাই হয় না।

লিপির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে সে তো ভাবীজিকে লিপির দিদি বলেই মনে করেছিল। সে ভুল ভেঙেছিল বেশ কিছুদিন পরে।

তখনই প্রথম জেনেছিল যে দিদি নয়, তিনি লিপির বৌদি এবং বিয়ের অতি অল্প পরে দাদা মারা যান বলে একরকম বালবিধবা হয়ে শ্বশুর-বাড়িতে থেকেই বাড়ির মেয়ের মত পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শেষ ধাপ পর্যন্ত উঠেছেন।

তিনি যে বাঙালী নন এই খবরটুকু শুধু তখন জানার সুযোগ হয়নি। এ-কথাও তখন জানতে পারেনি যে তেইশ পল্লীর তিন কাঠা জমির পুরোনো দোতলা বাড়িটা লিপির দাদার মৃত্যুর পরে ইনসিওরেন্সের টাকায় ভাবীজিরই কেনা।

সেদিন শেষ পর্যন্ত লিপির সঙ্গে দেখা হয়নি বলেই যেন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, দেখা সেদিন হয়নি।

ভাবীজি তাকে চা করে খাইয়েছিলেন। লিপি ততক্ষণেও না আসায় লোকেশ আর থাকতে কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। বিশেষ করে অস্বস্তি হচ্ছিল ভাবীজি সম্বোধনটা তখনও মুখে আনতে আটকাচ্ছিল বলে।

ভাবীজি তা বুঝেছিলেন। এক সময়ে তাই হেসে বলেছিলেন, যাও আজ তুমি হোস্টেলে ফিরে যাও লোকেশ, আজ এখানে আর বেশীক্ষণ থাকলে জিভটাই আড়ষ্ট হয়ে যাবে।

তাই চলে এসেছিল লোকেশ, অত্যন্ত অপ্রস্তুত ভাবে কেমন যেন অপরাধীর মত।

কিসের এ অপরাধ-বোধ? তা বুঝতে পারেনি লোকেশ, কিন্তু তারপর আর বহুদিন ও গলির রাস্তায় আর যায়নি।

লিপির সঙ্গে অবশ্য দেখা করেছে ঠিকই। দেখা করেছে তার কলেজের পর পাশের বড় পার্কটায়। সেখান থেকে কোন রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসেছে কিছুক্ষণের জন্যে। কোনদিন বা দুজনে মিলে ম্যাটিনি শোতে গেছে চৌরঙ্গীর কোন সিনেমা হলে। লিপিদের বাড়ির কথা একবারও তোলেইনি এর মধ্যে।

লিপিই একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি অনেকদিন আমাদের বাড়ি

যাওনি না? কেন বল তো?

কেন? লোকেশ যেন নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে তারপর উত্তরটা ভিতর থেকে বার করেছে, যাইনি যাবার দরকার হয়নি তাই। তোমার সঙ্গে তো রোজই দেখা হচ্ছে।

তবু যেও একবার। লিপি বলেছে, লো বলছিল তোমার কথা।

লো বলছিল! একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের মত যন্ত্রণা আর আনন্দে মেশানো অনুভূতি বুকের ভেতরটা যেন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

বাইরে সেটা প্রকাশ পেতে দেয়নি বলেই তার বিশ্বাস। প্রায় নির্বিকার ভাবে মন্তব্য করেছিল, ও! বলছিল বুঝি! যাব তাহলে এর মধ্যে একদিন।

তারপর প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যেই জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, তুমি লো বল কেন বল তো।

লো কেন বলি? লিপি হেসে এবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল,—প্রথম আমাদের বাড়ি এসে বেশির ভাগ কথা ভুল বলত ও। যেমন টাকাকে বলত রুপয়া ঘটিকে বলত লোটা। তাই থেকেই আমিই ছেলেবেলা মজা করে ওর নাম দিয়েছিলাম লোটা, সেই লোটার লো-টাই থেকে গেছে।

ভাবীজির ভিন্ন প্রদেশ থেকে আসার এই আরেকবার উল্লেখ পেয়েছিল লোকেশ।

ভাবীজির কথা রাখতে লিপিদের বাড়িতে তবু যায়নি অনেকদিন।

লিপি হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি লো-র ওপর রাগ করেছ।

লো-র ওপর রাগ! মুখে কিছু বলেনি লোকেশ। কিন্তু অবাক হয়ে লিপির দিকে চেয়ে তার কথাটাই মনে মনে আউড়েছিল নিজেরই একটা জিজ্ঞাসা নিয়ে।

লো-র ওপর সে রাগ করেছে এমন ভাবনা লিপির মাথায় এল কি করে! শুধু অনেকদিন ধরে দেখা করতে যায়নি বলে?

এ ভাবনা কি তার নিজের না ভাবীজিই তাকে এ-রকম কিছু বলেছেন। এসব কিছুই অবশ্য লিপির কাছে বলেনি।

মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাওয়ার পর লিপি প্রশ্নটা আর একবার করায় তাকে পাল্টা প্রশ্নই করেছিল উত্তর হিসারে। জিজ্ঞাসা করেছিল, এরকম অদ্ভুত প্রশ্নর মানে?

বাঃ, মানে তো খুব সোজা, লিপি ভুরু কুঁচকে বলেছিল, তোমায় অত করে বলা হয়েছে তবু একদিনও তুমি বাড়িতে যাচ্ছ না, তাতে কি মনে হয়?

জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়েছিল লোকেশ। কথাটা যেন মজার এই ভাবেই বলেছিল, তোমাদের বাড়ি নিয়মিত হাজিরা দিতে হবে এ-রকম কড়ার করে তোমার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না।

বাজে বোকো না যাও, লিপি রাগের ভান করেছিল, বাইরে যেমন তেমনি বাড়িতেও আগে দেখা করতে যেতে। সেটা হঠাৎ ছেড়ে দিলে কেন?

এবার উত্তরটা চট্ করেই দিয়ে ফেলেছিল লোকেশ, বোধহয় অস্বস্তিটা বেশ অসহ্য হচ্ছিল বলে, বলেছিল, ধরা ছাড়ার কোন কথাই এখানে নেই। কয়েকদিন যাইনি, আবার কতদিন যে রোজ রোজ গিয়েছি। ও কি হিসেব করে লৌকিকতায় যাওয়া।

বেশ, কাল তাহলে এস। লিপি প্রায় হুকুমের স্বরে বলেছিল, কাল আমার কলেজ নেই। বাড়িতেই থাকব।

খানিক চুপ করে থেকে একটু যেন রাগ করার ভান করেছিল লোকেশ। বলেছিল, তোমারই বা এত জেদ কেন বল তো? বাড়িতে গিয়ে দেখা করলে কি তোমার মান বাড়ে?

বাড়েই তো—লিপি হেসে উঠে সমস্ত ব্যাপারটা হাল্কা কৌতুকের স্তরে নিয়ে গিয়েছিল, আমার যে কি রকম সব ভক্ত আছে তা বাড়িতে দেখাতে ইচ্ছে করে না!

এবার হেসে উঠেছিল লোকেশও, বলেছিল কি রকম সব মান! তোমার

আরও ভক্ত আছে নাকি ? জানতাম না তো !

তুমি জানবে কোথা থেকে ! লিপি রহস্যময়ী সেজেছিল।

বেশ—লোকেশ সুযোগ নিয়েছিল খোঁচা দেবার, তাহলে তাদের সকলকে এক এক করে বাড়িতে যেতে বললেই পারো। এ-অধীনের ওপর ও হুকুমটা না-ই করলে।

কথায় লিপিও কম যায় না। চটপট জবাব দিয়েছিল, হুকুম কি কারুর মত নিয়ে করতে হয় নাকি। আমি বলছি কাল তুমি আমাদের বাড়িতে যাবে। নইলে আর তোমার সঙ্গে দেখাই করব না কখনও।

এ বড় কঠিন শাসানি নয় ? লোকেশ গলাটাকে করুণ করেছিল, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যদি বাহাদুরী দেখাবার জন্যে হয়, তাহলে দেখবার লোক তো তোমার ওই লো ছাড়া আর কেউ নেই !

কে আছে না আছে আমি বুঝব—লিপি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শাড়িটা হাত দিয়ে একটু ঝেড়ে নিতে নিতে বলেছিল, সোজা কথা কাল তুমি যাবে।

লোকেশও তখন উঠে পড়ে পাশে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন তারা কার্জন পার্কের অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে ঘাসের ওপর বসে ছিল।

সেখান থেকে উঠে এসপ্ল্যানেডের ট্রামের লাইনগুলোর দিকে যেতে যেতে লিপি লোকেশকে অত করে যেতে বলার আসল রহস্যটা প্রকাশ না করে পারেনি। বলেছিল, কাল তোমায় আরো অত করে যেতে বলছি কেন জানো ? কাল লো দইবড়া করছে, লো-র দইবড়া কি জিনিস তার স্বাদ তো পেয়েছ !

হ্যাঁ, তা পেয়েছি ! লোকেশ সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে মুগ্ধ কণ্ঠেই স্বীকার করেছিল, তোমার লোটা থেকে লো বানানোর কথা শুনে টানটা কেন ওদিকে তাও বুঝেছি এখন।

এ খবর শোনার পর আর না গিয়ে পারবে ! লিপি যেন চ্যালেঞ্জ করেছিল।

পারব ! পারব ! চিৎকার করে একবার বুঝি বলবার ইচ্ছে হয়েছিল

লোকেশের। ইচ্ছে হয়েছিল বলে, এর চেয়ে ঢের বড় অদম্য আকর্ষণের বিরুদ্ধে তাকে যুঝতে হচ্ছে।

কিছুই অবশ্য বলেনি। লিপিকে টালিগঞ্জের ট্রামে তুলে দিয়ে নিজে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ইংরেজি সিনেমা পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছিল, কখনও বাইরে থেকে পোস্টার, কখনও লবিতে ঢুকে সব ছবি দেখে দেখে।

এমনি দেখতে দেখতেই নিউ এম্পায়ারের ছোট সঙ্কীর্ণ গলিতেই তাকে এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

মার্কিন এক অভিনেত্রীর শুধু মুখ-টুখ নয় যাকে বলে ফিগার ছবি।

এ অভিনেত্রীর কথা লোকেশ কাগজে পড়েছে, বেশিদিন সিনেমা রাজ্যে থাকেন নি। দু-চারটি ছবিতে কাজ করার পর কোন্ সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারে বিয়ে করে চিত্রজগত ও আমেরিকা থেকেই চিরকালের মত বিদায় নিয়েছেন।

যে দু-চারটি ছবিতে নেমেছেন তাতেই কিন্তু মাত করে দিয়ে গেছেন, কাউকে ধারে কাছে ঘেঁসতে না দিয়ে। আশ্চর্য চরিত্র হিসেবে নেমে প্রবীণ নায়িকাকেই ম্লান করে দিয়েছেন শুধু অভিনয়ে নয় দুর্লভ রূপেরও সূক্ষ্ম এক আকর্ষণে। এ সব কথা মনে পড়ার দরুণ ছবিটা দেখে লোকেশ সেখানে দাঁড়ায়নি।

সে দাঁড়িয়েছিল অভিনেত্রীর স্থির অবস্থা থেকে যেন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ানো একটি বিশেষ ভঙ্গিতে। লম্বা ঢিলে স্কার্ট পরা শরীরে এই ঘোরার ঝটকায় যে হিল্লোলটা দেখা দিয়েছে তাই অত্যন্ত শক্তিমান চুম্বকের মত টেনে ধরেছিল লোকেশের চোখ। এ ধরণের হিল্লোল সে কি কোথাও কখনও দেখেছে? দেখেছে শরীরের এমন একটি সচল ভঙ্গি যা বুকের ভেতর বিদ্যুৎ প্রবাহ বইয়ে দিয়ে যায়?

আজ কার্জন পার্কে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি থেকে ধুলো আর ঘাসের কুচি ঝেড়ে ফেলবার সময় সে লিপির দিকে লুব্ধ বর্বরের মত একদৃষ্টে চেয়েছিল!

লিপির গড়ন খারাপ নয়। পাতলা লম্বা চেহারায় কেমন একটা সুস্থ

বেগময়তার আভাস আছে।

কিন্তু···লোকেশের মনটা গঙ্গার ধারের ভ্রমণেতে তার লোহার বেঞ্চিটায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

একটা সিগারেট দিন না!

অনুরোধটা ভিক্ষের মত বিনীত নয়। খানিকটা তাচ্ছিল্য মেশানো অনুগ্রহের মত। সিগারেট চাওয়াটাই যেন অনুগ্রহ।

লোকটাকে একটু ভাল করে এবার লক্ষ্য করেছে লোকেশ। ছেঁড়া ময়লা প্যাণ্ট, পায়ে খাঁকি তালিমারা ক্যাম্বিশের জুতো, গায়ে একটা সস্তা রং-ওঠা হাওয়াই। দু-একদিনের দাড়ি গোঁফের জঙ্গল মুখে। চুল তামাটে শুকনো কিন্তু একেবারে এলোমেলো নয়। এ ধরণের মানুষ লোকেশের অচেনা নয়।

অন্যদিন হলে তাকে নিয়েই খানিকটা সময় কাটাত।

বিদ্রূপ করে মজা দেখবার জন্যে নয়, সত্যিই জীবনের কি বিচিত্র ঘূর্ণি এ সব মানুষকে নদীর পাড়ের ওই ছড়ানো কাঠকুটো জঞ্জালের মত এ শহরে ছড়িয়ে ফেলছে তা একটু বোঝবার চেষ্টার জন্যে। আজ কিন্তু সে মেজাজ নেই।

সিগারেট নেই। খাই না। লোকেশ একটু গম্ভীর ভাবে বলেছে।

বলেই উঠে যেতে পারত কিন্তু ওটা যেন শুধু একটা সিগারেট চাওয়ার অপরাধে বড় অন্যায় অপমান বলে মনে হয়েছে। তাই উঠে না গিয়ে আর একটু হেলান দিয়ে বসে দৃষ্টিটা সোজা সামনের দিকে নিবদ্ধ করেছে লোকেশ।

লোকটা কিন্তু তাকে রেহাই দেবে না। তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা তছনছ করে তবে ছাড়বে। জিজ্ঞেস করেছে, সিগারেট খান না কেন? ক্যান্সারের ভয়ে!

যত বিরক্তই হোক একটু চমকে লোকেশকে লোকটার দিকে চাইতে হয়েছে।

লোকটা হাসছে না। তার পক্ষে অস্বাভাবিক একটা কথা বলে ফেলেছে বলে কোন বাহাদুরীর আভাও সেই শুকনো দুদিন না কামানো মুখে

নেই।

লোকটা তখন নির্লিপ্ত ভাবে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছে।

লোকেশকে তার দিকে চমকে ফিরতে দেখে সেও যেন এতক্ষণে ভাল করে তাকে লক্ষ্য করেছে। তারপর জ্ঞান দেওয়ার ভঙ্গিতেই বলেছে, সাবধান হওয়া ভাল। কিন্তু সিগারেট খেলেই ক্যান্সার হয় না। আর হয় যদি তাতেই বা কি? সবচেয়ে বড় রোগ কিসে হয় তা জানেন!

এবার লোকটার চোখ-মুখ যেন ওরই মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দিয়ে লোকেশকে যেন ধরে রেখে অবার সে জিজ্ঞাসা করেছে, জানেন?

না। সংক্ষেপে উত্তরটা দিয়ে মুখটা ফেরাতে চেয়েছে লোকেশ, কিন্তু পারেনি লোকটার মুখের অদ্ভুত হাসিটা লক্ষ্য করে—

সেই অদ্ভুত হাসি নিয়েই লোকটা যেন পড়া বোঝানোর মত আঙুল তুলে নেড়ে নেড়ে বলেছে, সবচেয়ে বড় রোগ হয় বাঁচলে। না বাঁচলে আর কোন রোগ নেই। বাঁচাটাই ছেড়ে দিতে পারেন?

লোকটা পাগল নিশ্চয়। কিন্তু কি রকম পাগল?

লোকেশ লোকটার এই অদ্ভুত কথাগুলোর দাম হিসেবেই পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দিতে যাচ্ছিল, কোথাও গিয়ে সিগারেট কিনে খাবার জন্যে।

কিন্তু তার সময় পায়নি। লোকেশকে বেঞ্চি ছেড়ে উঠতেও হয়নি। লোকটাই হঠাৎ নিজে থেকে উঠে চলে গেছে অন্যদিকে।

ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত লেগেছে লোকেশের। এ যেন সিনেমার একটা চরিত্র হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে একটা মজার চমক দিয়ে গেল।

কে জানে লোকটা সত্যিই কোন সিনেমা থেকে চুরি করা কথা বলেই তাকে চমকে দিয়ে গেল কিনা!

ছবি-টবি লোকেশ দেখে না। হিন্দী ছবি তো নয়ই। তাতে অনেক রকম প্যাঁচটঁ্যাচ নাকি থাকছে আজকাল।

না, লোকটার প্রতি অন্যায় অবিচার করছে লোকেশ। সস্তা চালাকির প্যাঁচ হলে লোকটা দাম আদায়ের জন্যেই তা ব্যবহার করত। তা সে তো করেনি।

আধপাগল লোকটা যে বোধ-টায় গিয়ে পৌঁছেচে, সেটার মধ্যে তার নিজের দিক দিয়ে হয়তো ফাঁকি নেই।

আর খানিকক্ষণ এইখানেই এখন বসে থাকা যায়। এখন জায়গাটা একেবারে নির্জন নির্ঝঞ্ঝাট। কিন্তু আর ভাল লাগে না লোকেশের, সুরটা কেটে গেছে। পুরোনো স্মৃতির পাতাগুলো বড় পলকা ঝরঝরে। একটু অসাবধান হলেই যেন গুঁড়ো হয়ে ঝরে যাবে।

দরকারই বা কি সেগুলো আবার নাড়বার। এতদিন যা করেছিল তাই আবার করুক না কেন? চাপা থাক সব কিছু মনের পাতালের গোপন সিন্দুকে।

লোকেশ উঠে পড়ে গাড়িটার কাছেই গেল।

গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কোথা থেকে একটা ছোকরা এসে দাঁড়িয়ে সেলাম করে বলল, সেলাম সাব। আমি এতক্ষণ গাড়ি দেখছি।

লোকেশ ছেলেটার দিকে তাকাল।

ভিক্টর হুগোর লেখায় প্রথম প্যারিসের রাস্তায় যে গ্যামিনদের কথা পড়েছিল তাদের জাত ভাইয়েরা আজকাল কলকাতার রাস্তাতেও দেখা দিয়েছে।

ময়লা ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট শার্ট বা গেঞ্জি। পায়ে জুতোর বালাই বেশির ভাগই নেই। চুল কিন্তু সবারই বেশ ভাল ভাবে ব্যাক-ব্রাশ করে আঁচড়ানো, আর রোগা-শুকনো হলেও চোখ মুখ উৎসাহে বুদ্ধিতে ঝকমক করছে যেন।

মনে যাই থাক লোকেশ বাইরে গম্ভীর হবার ভান করে ধমক দিলে ছেলেটাকে, এতক্ষণ ধরে তুমি গাড়ি দেখছ? কে তোমায় দেখতে বলেছে শুনি?

ছেলেটার কিন্তু এ ধমকে ভড়কাবার নামই নেই। বললে, বলবে আবার

কে? ভঙ্গিটা যেন ঈষৎ উদ্ধত কৌতুকের—না দেখলে সব চুরি হয়ে যেত যে।

চুরি হয়ে যেত! আরো কড়া গলায় বললে লোকেশ, লক করা গাড়ি তবু কি চুরি হয়ে যেত শুনি? চুরি করলে তুমিই করতে!

ছেলেটা দু' কাঁধ নেড়ে একেবারে সিনেমা হিরোর ভঙ্গি করে বললে, লে বাবা! আমিই চুরি করতাম! আমি চুরি করলে আবার এখানে এসে আপনাকে সেলাম দেব কেন? এতক্ষণে ত গঙ্গার পার হয়ে যেতাম।

বেশ, বুঝলাম। লোকেশ যেন এতক্ষণে ছেলেটার যুক্তি মানতে বাধ্য হয়ে বলেছে, কিন্তু লক-করা গাড়ি থেকে কি চুরি যেতে পারত শুনি?

কেন? ছেলেটা তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিলে, ওই আপনার চাকার ক্যাপগুলো, ওগুলো বেচলেই তো শালা চার প্যাকেট!

তা যাঃ! এবার হেসে ফেলে পকেট থেকে একটা আধুলি তাকে দিয়ে গাড়ির লক খুলতে খুলতে লোকেশ বললে, এতে ক' প্যাকেট হয় দেখ গিয়ে।

ডবল সেলাম সাব! ছেলেটা আধুলিটা আঙুলের টুসকিতে ওপরে ছুঁড়ে আবার লুফতে লুফতে হেলে দুলে চলে গেল।

লোকেশও তখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে আবার চালাতে শুরু করেছে।

ইডেন গার্ডেনসের দক্ষিণ দিয়ে এবার সোজা এসপ্ল্যানেডের দিকেই যায়। যেতে যেতে গঙ্গার ধারের প্রমেনেডের বেঞ্চির সেই মানুষটা আর গাড়ি পাহারার দাবী করা ছেলেটার কথাই ভাবে একটু।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে মনটা ঘুরিয়ে দেবার সব উপাদান। জীবনটা তো এইসব উপাদান দিয়েই গড়া। তার মধ্যে মনের এই যন্ত্রণা-বিলাস কেন! উপস্থিত বাস্তব তাৎক্ষণিক এই সব টুকরো অভিজ্ঞতা জুড়ে জুড়েই জীবনটার একটা অসংলগ্ন নক্শা বুনে যাওয়া। তার বেশি কিছু করতে যাওয়াই মূঢ়তা।

আমাদের স্মৃতি একটা সম্পদ, সেই স্মৃতিই আবার অভিশাপ।

স্মৃতিই সব জুড়ে জুড়ে রাখে বলে এত অনাবশ্যক যন্ত্রণা, এত অকারণ

দুঃখ ভোগ। বাঁচাটাই ছেড়ে দাও। না তা কেন? ওটা তো পাগলের প্রলাপ!

বাঁচো প্রত্যেকটি উপস্থিত মুহূর্ত নিয়ে, ইন্দ্রিয়-গোচর তাৎক্ষণিক আনন্দ নিয়ে। আনন্দ না বলে সুখ বল তাতেও আপত্তি নেই।

গাড়িটা এসপ্ল্যানেডের কাছের সেই ট্রাফিক আইল্যাণ্ডে এসে গেছে।

বাঁদিকে রাজভবন রেখে উত্তর মুখে এগিয়ে গিয়েও ট্রাফিক সিগন্যালের জন্যে দাঁড়াতে হয়।

কোথায় যাবে এবার? ডালহাউসিতে হেড অফিসে একবার যেতে পারে। তাই যাওয়াই ভাল। নিজের অফিস কামরায় নিজেকে বন্দী করে কাজের মধ্যে সব কিছু ডুবিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া এখন বাসায় ফেরার একটু অসুবিধে আছে। দুপুরে বাইরে লাঞ্চ খাবে বলে এসেছে। এখন শ্রীমান মনোহর হয়তো বাসাতেও নেই। চাবি-টাবি দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

তেমন দরকার হলে তাকে অবশ্য খুঁজে বার করা যাবে। তার আড্ডা দেবার জায়গা ওপাড়ায় দুটি। সাহেবকে আগে থাকতে না জানালে তার বাইরে অন্য কোথাও যায় না। কিন্তু ওসব খোঁজাখুঁজির হাঙ্গামায় কোন প্রয়োজন নেই। সোজা সে এখন অফিসেই যাবে।

সঙ্কল্পটা ঠিক করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের পোশাকের দিকে তার দৃষ্টি পড়ে। পোশাকের কথাটা তো এতক্ষণ সত্যি মনে ছিল না।

এটা তো অফিস যাবার পোশাকই নয়। অন্তত সে কখনও এমন সাজে সেখানে যায় না। এ পোশাকে বড় জোর কনস্ট্রাকশন সাইটগুলো তদারক করে ফেরা যায়। তাও নিত্যকার নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হিসাবে।

না, অফিসে সে যাবে না।

একদিনের জন্যে নিয়ম ভাঙলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে বলে সে মনে করে না। তেমন দরকার পড়লে সে সব নিয়ম অনায়াসে ভাঙতে পারে। কিন্তু আজকের মেজাজটা বিদ্রোহের সুরে বাঁধা যেন শক্ত। তার দরকার নেই।

এই তো এতক্ষণ বেশ সবকিছু ভুলে আছে।

ক্ষত যদি কোথাও একদিন গভীর হয়ে থাকে তার ওপর কুঞ্চিত বিবর্ণ যা-ই হোক নতুন ত্বকের আবরণ তো পড়েছে! নাই বা তা আবার খুঁচিয়ে তুলল।

ডি· রায় নামে কার একটা বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন। বাড়িটা তেইশ পল্লীর একটা পুরোনো দোতলা।

ওই সামান্য মিলটুকু ধরে আর নিজেকে এমন পীড়িত করবার দরকার কি? ডি রায় অমন হাজারজনের নাম হতে পারে। আর তেইশ পল্লীতে তিন কাঠার পুরোনো দোতলা বাড়ি একটাই নেই।

লোকেশ অফিসেও যায় না, নিজের বাসাতেও নয়। গাড়ি ঘুরিয়ে সেনট্রাল অ্যাভেনিউর একটা চীনে হোটেলে গিয়ে লাঞ্চ খেতে বসে।

কাঠের পার্টিশন দেওয়া একটা নেহাৎ সঙ্কীর্ণ কামরাতে একাই সে বসেছে। হোটেলটার এককালে সুনাম ছিল। এখন আর নেই।

টেবিল চেয়ার আর টেবলক্লথের চেহারাতেই অবস্থাটা বোঝা যায়।

কিচেনের নানা রান্নার মিশেল গন্ধটা এই বসবার কেবিনগুলোতে পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। আগেকার ভিন্নরকম স্মৃতির দরুনই এখানে ঢুকে পড়েছে। এখন অবশ্য উঠে গেলেও পারে। অর্ডার নিতে কেউ আসেনি।

কিন্তু উঠে যেতে আর পারে না একটা নিষ্ক্রিয়তার আলস্যে। এখান থেকে উঠে আবার একটা হোটেল খোঁজার মত উৎসাহ মনের ভেতর নেই। তার বদলে অর্ডার নিতে যে আসে তাকে বলেই টেবলক্লথটা পাল্টে নেবার ব্যবস্থা করে।

অর্ডার যে নেয় চেহারায় সে চীনা। কিন্তু ওই পর্যন্তই চীনের সঙ্গে বোধহয় সম্পর্ক। কত পুরুষ এই কলকাতাতেই তাদের কাটছে কে জানে।

ইংরেজিটা একরকম বলে! তার চেয়ে ভাল বলে বাংলা।

লোকেশকে কি করে ঠিক বাঙালী বলে চিনে ফেলে দু-চারটে ইংরেজির পর বাংলাতেই কথা বলা শুরু করে। সময় যে কত বদলাচ্ছে এটা তারই প্রমাণ।

এককালে বাংলা বলাটায় এদের উৎসাহ ছিল না মোটেই।

এককালে মানে বছর আট নয় আগেই বোধহয়।

এই হোটেলেরই আরেকটা অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ছে।

লিপি, তার লো, এমন কি হরিবাবুকেও নিয়ে এসেছিল এইখানেই খাওয়াতে। এসেছিল সন্ধ্যার পর। একটা শনিবারই হবে বোধহয়। দারুণ ভীড়। কেবিন খালি নেই। বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্যাসেজের ধারেই কটি চেয়ারে।

তাও দুটি মাত্র বেতের চেয়ার জুটেছিল। তবে হরিবাবু আর লিপির বৌদিকে বসিয়ে লিপি আর সে বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

লিপির লো বলে ডাকার রহস্য জানবার বেশ আগের ঘটনা।

তখনও নাম ধরে ডাকা বা ভাবীজি বলার কোন প্রশ্নই ছিল না। সম্বন্ধটা তখন লৌকিকতার স্তর ছাড়িয়ে বেশি দূর যায়নি। হরিবাবুর সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়ে তখন লিপির সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়েছে মাত্র। হরিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বাবাই বলেছিলেন। মফস্বল শহর থেকে প্রথম কলকাতার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে আসছে। বাবা তাই পুরোনো সহপাঠী ও বন্ধু হরিনাথ রায়ের কাছে একটা চিঠি দিয়ে দেখা করতে পাঠিয়েছিলেন।

লোকেশের স্মৃতিচারণ বাধা পেল :

দুপুরবেলা সে একটু আগে আগেই হোটেলে এসে বসেছে। জায়গাটা তাই প্রথমে নির্জন এবং একটু নিস্তব্ধ পেয়েছিল। এবার খদ্দেরদের আসা শুরু হয়েছে। প্যাসেজের অন্যধারে বড় কেবিনটায় একটা দল এসেছে ছেলেমেয়ে নিয়ে। বাঙালী নয়। পঞ্চনদবাসীই মনে হচ্ছে। কিন্তু হট্টগোল করছে বড় বেশি।

ঠিক এ ধরণের খদ্দের তখন বোধহয় ছিল না। এখন আবহাওয়াটা অনেক সহজ স্বাভাবিক হয়েছে বলতে পারা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে খেতে আসা বিলাসের পক্ষে তখনকার চেহারা আর চালটাই যেন ভাল ছিল। একজন বেয়ারা এসে তার টেবিলে ছুরি-কাঁটা সাজিয়ে রুটি মাখন প্লেট

সার্ভিয়েট রেখে যাচ্ছে। সার্ভিয়েটের চেহারাটা দেখলে ভক্তি আসে না। ধোয়া পরিষ্কার, কিন্তু বহুদিনের ব্যবহারে রেঁায়া উঠে বাতিল করবার অবস্থাই হয়েছে।

থাক্, এসব যেমনই হোক্, রান্নাগুলো মুখে দেবার মত হলেই হয়!

ও পাশের বড় কেবিনটা আবার খালি হয়ে গেল। কি ব্যাপারে যেন ওদিকের পরিবারের কর্তার মন ওঠেনি। তিনি সপরিবারে চলে গেলেন তাই।

লোকেশ আবার একটু শান্তি পেয়েছে। মনটা তাই সেই আগের সন্ধ্যাটায় ফিরে গেল। সে আর লিপি বাইরে গেটের কাছেই রাস্তার ট্রাফিক দেখছিল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

ব্যাঞ্জো বাজিয়ে একটা হা-ঘরে চেহারার ফিরিঙ্গি ছোকরা বিলেতী গান গাইছিল গেটের বাইরে রাস্তার ফুটপাথে।

ভিক্ষের একটা নতুন ভাল ফিকির। লোকেশ আর লিপিকে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে তাদের কাছে এসে সে একটা গান শুরু করেছিল। কথাগুলো তার উচ্চারণের দোষে কি লোকেশের বোঝবার অস্পষ্টতায় কেমন জড়ানো লেগেছিল। কিন্তু গানটা যে ভালবাসার তা বুঝতে কষ্ট হয় নি।

লোকেশের একবার ইচ্ছে হয়েছিল লিপির দিকে চেয়ে একটু হাসে। কিন্তু তখনও পরিচয়টা ওই ধাপে পৌঁছয়নি। লিপি আর সে দুজনেই তাই একটু আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গানটা শুনেছিল।

গান শেষ হবার পর পকেট থেকে একটা আধুলি বার করে গাইয়েকে দেবার সময় হঠাৎ চমকে উঠেছিল পিছন থেকে একটু হাসির সঙ্গে প্রশ্নটা শুনে—

কি, একটা শুনেই আশ মিটে গেল? আরেকটা শুনলে কি হয়!

একটু লজ্জিত অপ্রস্তুত হয়ে লোকেশ ফিরে চেয়েছিল। লিপির বৌদি কখন ভেতর থেকে উঠে এসে সেখানে দাঁড়িয়েছেন সে বুঝতে পারেনি।

লিপি কিন্তু তার চেয়ে সহজ হয়ে একটু ঠাট্টার সুরে বলেছিল, শুনবে

আরেকটা ?

ব্যাঞ্জোবাদক কিন্তু তাদের অনুরোধের অপেক্ষায় তখন আর নেই। সে বাংলা বুঝে বা তাদের ধরণ দেখেই আরেকটা গান তখন শুরু করেছে। কথাগুলো আরও অস্পষ্ট। কিন্তু সুরটা ভারী মিষ্টি।

লিপির বৌদি তার আর লিপির মাঝখানে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে শুনতে তাদের দুজনের মুখের দিকেই যে এক একবার চাইছিলেন তা চোখে না দেখেও যেন অনুভব করছিল লোকেশ।

আশ্চর্য এই যে, এই দৃষ্টিতে যে অস্বস্তি বোধ করবার কথা তা কিন্তু সে করেনি। কেমন একটা আচ্ছন্নতা তখন যেন সমস্ত অনুভূতির ওপর বিছিয়ে গিয়েছিল। ব্যাঞ্জোবাদককে আর একবার বকশিস দেবার সময়ই ভেতর থেকে বয় এসে তাদের কেবিন খালি হয়েছে বলে খবর দিয়েছিল। কেবিনে বসে বাঁধানো মেনুর কার্ডটা হাতে নিয়ে পড়তে গিয়েই হঠাৎ চমক লেগেছিল লোকেশের। এই যাঃ! বড় ভুল হয়ে গেছে! মুখ দিয়ে তার দারুণ অস্বস্তিটা প্রকাশ না করেও পারেনি।

কেন, কি ভুল হল আবার! হরিবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি আর লিপির বৌদি টেবিলের ওধারে লিপি আর লোকেশের মুখোমুখি বসেছিলেন।

ভুল মানে···অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে থেমে থেমে বলেছিল লোকেশ, এ হোটেলে আসাই ঠিক হয়নি।

তা তো হয়নি নিশ্চয়ই। হরিবাবু জোর দিয়ে বলেছিলেন কথাগুলো, প্রথম জলপানির টাকাই না হয় পেয়েছ। কিন্তু সে-টাকা এইসব হোটেলে অকারণে অপব্যয় করার কোন মানে হয়।

না না, আমি সেদিক দিয়ে বলছি না।—লোকেশ তার আপত্তির কারণটা একটু গুছিয়ে জানাতে পেরেছিল, আমার মনে পড়েনি যে এ হোটেলে নিরামিষের কোন ব্যবস্থা নেই।

নিরামিষের কোন ব্যবস্থা নেই! হরিবাবু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়েছিলেন, নিরামিষ কে খাবে! তুমি? তুমি নিরামিষ খাও নাকি!

খুব অন্যায় ! খুব অন্যায় ! এ বয়সে…

না, বাবা না। হরিবাবুকে বাধা দিয়ে থামিয়ে কৌতুক কুঞ্চিত চোখে লোকেশের দিকে তাকিয়ে লিপির বৌদি বলেছিলেন, লোকেশ আমার কথা ভাবছে। তা ভুল যখন করেই ফেলেছে তখন আমি না হয় শুধু জল খেয়েই থাকব।

গলার স্বর আর মুখের ভাব দেখেই এবার কেমন সন্দেহ হয়েছিল লোকেশের। পরের মুহূর্তে লিপির মৃদু আর হরিবাবুর গলা ছাড়া হাসিতেই সে সন্দেহের সমর্থন মিলেছিল।

নিরামিষের জন্যে ভাবতে হবে না। হরিবাবু হাসি থামিয়ে লোকেশকে আশ্বস্ত করেছিলেন, বৌমা আমরা যা খাই সবই খায়।

সমস্যা মিটে গিয়েছিল। সেদিনকার বাইরের খাওয়ার স্মৃতিটা সব দিক দিয়ে প্রীতিকরই বলা যায়, তবু তার মধ্যে সব চেয়ে কি উজ্জ্বল হয়ে আছে ?

উজ্জ্বল আর সেই সঙ্গে কি যেন একটা অস্বস্তি মেশানো ?

কৌতুকের আভায় উজ্জ্বল মুখে সেই প্রথম প্রচ্ছন্ন পরিহাসের কথাগুলো।

একটা না-বোঝা বিদেশী গানের মধুর সুরের সঙ্গে চেয়ে না দেখেও অনুভব করা একটা উপস্থিতির উত্তাপ ?

বয়, প্লেটে সূপ দিয়ে গেল। গন্ধটা ভালই পাচ্ছে, কিন্তু সূপ-বোলটার কানা একটু চটা। একবার ইচ্ছে হল তখুনি বয়কে ডেকে প্লেটটা নিয়ে যেতে বলে। আপত্তি করলে এই নিয়ে একটা গোলমাল বাধিয়ে বসে। কিন্তু কিছুই করল না শেষ পর্যন্ত। কয়েক চুমুক সূপটা মুখে দিয়ে সরিয়ে রেখে দিল।

অন্য খাবারগুলোর বেলাতেও তাই। কেন যে লাঞ্চ খেতে এমন জায়গায় ঢুকেছিল। এ জায়গার বদলে যেখানেই ঢুকুক আজ এর চেয়ে ভাল অবস্থা হত না তাও বুঝতে পারছে লোকেশ।

যাই হোক খানিকক্ষণ একটু আলাদা পরিবেশে একটু একলা তো

কাটানো যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা এর পর। যত দেরীই করুক এখান থেকে দাম চুকিয়ে এক সময়ে বার হতে হবে।

তারপর? তারপর সত্যিই তার সুপারভিশনের কাজে যেতে পারে। কিন্তু তা যে যাবে না সে বিষয়ে এখন আর মনে কোন সন্দেহ নেই।

হঠাৎ একটা কথা মনে হয়। একটা কাজ তো অনায়াসে করতে পারে? আবার একটা ফোন!

সকালে ফোন করে পায়নি। যে ধরেছিল সে পরের দিন ফোন করতে বলেছে।

কিন্তু তার কথাও তো ভুল বা মিথ্যে হতে পারে।

অন্তত আর একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতি তো কিছু নেই।

কিন্তু ফোন নম্বরটা? ফোন নম্বরটা লিখে সঙ্গে আনেনি। তা না আনুক। নম্বরটা মনে রাখা খুব সোজা। শুধু প্রথম দুটো সংখ্যা মনে রাখলেই হল।

কোথা থেকে এবার ফোন করবে তা হলে?

অফিসেই চলে যাবে ফোন করবার জন্যে?

তা যেতে পারে। কিন্তু একবার ফোন করবার কথা ভাবার পর সেটুকু তরও আর যেন সইছে না। খাবার টেবিল থেকে উঠে লোকেশ কেবিন থেকে বেরিয়ে সামনের দিকের কাউন্টারেই যায়।

খাবার অর্ডার যে নিয়েছে সেই চীনে ছোকরাই সেখানে বসে আছে

ভুল অভ্যাসের দরুণ ইংরেজিতে বলতে গিয়ে নিজেকে রুখে লোকেশ জিজ্ঞাসা করে, একটা ফোন করতে পারি?

নিশ্চয়, নিশ্চয় পারেন। চীনে ছোকরা তার টেবিলের ওপর রাখা ফোন গাইডটা লোকেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে ফোনের পাশে বসার চেয়ারটা দেখিয়ে দেয়।

না, গাইড লাগবে না বলে চেয়ারে বসে ডায়াল করতে করতে কিন্তু লোকেশের হাত গুটিয়ে নিতে ইচ্ছে করে একটা নতুন দ্বিধায়।

ফোন তো করবে এখান থেকে। কিন্তু এ চীনে ছোকরা যে আবার

বাংলা জানে ! সত্যিই যদি তার সেই 'ডি' এসে ফোন ধরে তাহলে এই লোকটার সামনে সচ্ছন্দে কথা বলা তো সম্ভব হবে না।

ফোন পাওয়াও তো একটা যন্ত্রণা হবে তখন। মনে মনে এসব কথা ভাবলেও ডায়াল করার নম্বরগুলো সে যান্ত্রিকভাবে ঘুরিয়েই যায় সমানে।

একটা এনগেজড্ আওয়াজ এবার আসুক।

কিন্তু তা আসে না। তার বদলে সত্যিই রিং হতে থাকে স্বাভাবিক ভাবে।

আর পিছিয়ে যাবার উপায় নেই। পাশে বসে কেউ বাংলা বুঝুক বা না বুঝুক কোথাও কেউ নেই মনে করে যতটুকু ফোনে বলবার বলতেই হবে তাকে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে রিং হয়ে যাচ্ছে। এখনও ধরবার কেউ ওখানে নেই বলে ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তা পারে না লোকেশ। কে যেন তাকে শেকল দিয়ে ওই ফোনটার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে।

হ্যাঁ ধরে থাকা তার সফল হয়েছে। কে একজন এসে ফোন তুলেছে।

হ্যালো শুনেই লোকেশ যা বোঝবার বুঝেছে। তবু বলে, ডি· রায়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

কার সঙ্গে? সেই সকালকারই কর্কশ অপ্রসন্ন কণ্ঠের জিজ্ঞাসা।

ডি, রায়ের সঙ্গে! লোকেশ ধৈর্য হারায় না, তিনি কাগজে একটা বাড়ি বিক্রীর বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাতে এই নম্বরে ফোন করবার কথা আছে। ডি· রায় ওখানে আছেন? একটু কথা বলতে পারি তাঁর সঙ্গে?

না, তিনি এখন এখানে নেই। সেই সাফ জবাব, যদি চান তো কাল সকালে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

কখন? লোকেশ জিজ্ঞাসা করে, অনুগ্রহ করে বলবেন।

দুঃখিত। সকালে ঠিক কখন তা আমার জানা নেই।

ওধারে ফোনটা নামিয়ে রাখার শব্দ হয়।

লোকেশও ফোনটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

কি! পেলেন না বুঝি? চীনে ছোকরা বাংলা শেখাটা একটু বিজ্ঞাপিত করতে চায়। তাই একটু উদারও হয়।

লোকেশ ব্যাগ খুলে ফোনের চার্জটা দিতে গেলে তা নেয় না। বলে, না না, একটা ফোনের আবার চার্জ কি? আর আপনি তো যাকে চান পেলেন না।

আচ্ছা ধন্যবাদ—লোকেশ নিজের কেবিনে ফিরে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, আমার বিলটা এখানেও তো চুকিয়ে দিতে পারি।

সে আপনার যেমন ইচ্ছে।

বিলটা বুঝি লেখাই ছিল। চীনে ছোকরা সেটা খাতা থেকে ছিঁড়ে নেয়।

সার্ভ যে করেছিল সেই বয় কাছে ঘুরঘুর করছিল, লোকেশ কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার পরই। টুথপিক রাখা প্লেটটায় বিলটা চীনে ছোকরার কাছ থেকে নিয়ে রেখে সসম্ভ্রমে সেটা বাড়িয়ে ধরে লোকেশের সামনে।

দাম চুকিয়ে একটু বেশী টিপসই রেখে আসে লোকেশ।

হোটেল থেকে বেরিরে যাবার সময় সেই ব্যাঞ্জো-বাজিয়ের কথা মনে হয়। এখন অবশ্য দিন দুপুর। কিন্তু রাত্রেও আর এ জায়গায় সে-রকম কারুর বাজনা বা গান শোনা যায় বলে মনে হয় না।

সেই পরিবেশই যেন বদলে গেছে। রাস্তাটা এখন বেশ নোংরা, আর ভিড়ও যেন অনেক বেশী।

শুধু তাই হয়তো নয়, সেদিনকার সেই মনটাই হয়তো হারিয়ে গেছে।

পিছনে কাঁধের কাছে সামান্য একটু নিঃশ্বাসের অস্ফুট শব্দ কি এক রহস্য শিহরণ কেন সেদিন তুলেছিল তা এখনও ঠিক জানে কি?

আবার গাড়িতে ওঠা, স্টার্ট দেওয়া, সামনে চালিয়ে যাওয়া।

কোথায়? তা ভাববার এখন দরকার নেই।

গাড়িটা যতদূর সোজা যেতে পারে যেতে দাও। তারপর দেখা যাবে।

সোজা শেষ পর্যন্ত গেলে তো বাগবাজারের খাল, যার পাশ দিয়ে

গ্যালিফ স্ট্রিট বোর্ড মারা ট্রামগুলো যাওয়া-আসা করে।

অতদূর যেতে হয় না। তার আগেই একটা অন্য সিদ্ধান্তের দরকার হয়। গাড়িটা যেতে যেতে একটু বেয়াড়াপনা করছে। লোকেশের গাড়ির তা করবার কথা নয়। অসম্ভব যত্ন নেয় লোকেশ তার গাড়ির। প্রায় য়ুরোপীয়দের মতই। সব সময়ে দামী বেহালার তারের মত তার সব যন্ত্রপাতি নিখুঁত ভাবে তদারক করে থাকে। এতটুকু দোষ-ত্রুটি সে অবহেলা করে ফেলে রাখে না।

তাহলে ? মনের মধ্যে প্রশ্নটা তোলবার পরই তার হাসি পায়। এমন একটা সোজা কথা তার মাথায় আসেনি !

গাড়ির তেল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে। বাড়ি থেকে বার হবার পর কাজের জায়গায় যাবার পথেই আজ তেল ভরে নেবার কথা।

আজ সকালের মনের অস্থিরতায় সে কথাটা আর মনেই ছিল না।

সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউর ধারে পেট্রোল পাম্পের অভাব নেই। কাছাকাছিই একটা দেখে লোকেশ গাড়িটা ঢুকিয়ে পাম্পের যত কাছে সম্ভব দাঁড়ায়। সামনে আরেকটা গাড়ির তেল ভরা হচ্ছে। লোকেশকে তাই একটু পিছিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে।

দুপুরে বড় গরম। গাড়ির ভেতর বসে থাকা যায় না। লোকেশ দরজা খুলে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ সামনের গাড়িটার দিকে দৃষ্টি পড়ে। প্রথমে গাড়িটার দিকে তারপর নম্বরটার।

আরে, এ তো পাকড়াশীর গাড়ি। পাকড়াশী গাড়ির ভেতরেই বসে আছে। লোকেশ একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। পাকড়াশী তাকে দেখতে না পেলেই বাঁচে এখন। পাকড়াশীর তেল ভরা হয়ে গেছে। এই পাম্পেরই সে নিয়মিত খদ্দের নিশ্চয়। টাকা না দিয়ে শুধু সই করে যাচ্ছে তাই। সই সেরে পাকড়াশী গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় নামার জন্যে ডাইনে ঘোরে।

যাক্, বিপদ তাহলে কেটে গেছে।

কিন্তু লোকেশের কপাল খারাপ। রাস্তায় নামতে গিয়েই পাকড়াশী

দেখতে পায় লোকেশের গাড়িটা। তৎক্ষণাৎ ব্রেক কষে থামিয়ে গাড়িটা সবেগে ব্যাক করে যে রকম উত্তেজিত ভাবে নেমে আসে তাতে মনে হয় একটা জীবন মরণ সমস্যায় সে দিশেহারা হয়ে আছে।

আরে তোমায় আমি কি খোঁজা খুঁজছি তুমি ভাবতে পারো না।

বন্ধু হলেও লোকেশের পদগৌরবটুকুর জন্যেই বোধহয় পাকড়াশী গরু খোঁজা কথাটা ব্যবহার করে না।

খোঁজার কারণ না জানলে কেমন করে ভাবব?—লোকেশ গলাটা একটু ক্লান্ত আর নির্লিপ্তই রাখে। তাইতে যদি পাকড়াশীর হাত থেকে এখন রেহাই পাওয়া যায়। তা যায় না। নতুন এক পার্টির সঙ্গে তাদের কাজের ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া হবে। সে বিষয়ে অভিজ্ঞ বলে লোকেশের সেখানে থাকা দরকার এই ওপর মহলের ইচ্ছা। পাকড়াশী তাই লোকেশকে তার বাসাতেই ফোন করেছিল। লোকেশ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছিল বলে পায়নি। তারপর কাজের ব্যাপারে যেখানে যেখানে লোকেশের যাওয়া সম্ভব সব জায়গায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার ভাগ্য ভাল যে এমন আশাতীতভাবে এই পাম্পে দেখা হয়ে গেল।

লোকেশকে অফিসেই যেতে হয়। সারাদিন কাটাতেও হয় সেখানে কাজের অপ্রত্যাশিত চাপে।

বাসায় যখন ফেরে তখন সত্যিই ক্লান্ত। এ ক্লান্তির জন্যে ভাগ্যের কাছে তার কি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়? এ ক্লান্তি, এ অবসাদ মনকে অসাড় করে দিয়ে থামিয়ে দিতে পারে না নিরর্থক স্মৃতি মন্থনের যন্ত্রণা?

কই আর তা পারল।

বিছানায় শোবার পর সেদিন আর বই পড়বার জন্যে ল্যাম্পটা জ্বেলে রাখে না।

ঘরটা অন্ধকার হয়েছে, তেমনি অন্ধকার হয়ে যাক মন। কিন্তু সেই অন্ধকার যেন স্পন্দিত আলোড়িত হয়ে ওঠে কোন্ সব পুরাতন দিনের উত্তেজনায় উদ্বেগে।

দইবড়ার নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হয়েছিল লোকেশকে।

বাবাঃ, কতদিন বাদে এলে ? এ রাস্তাই যেন ভুলে গিয়েছিলে। চরকির মত ব্যস্ততার মধ্যে ক্ষণিকের একবার সম্ভাষণ।

ভয়ানক ব্যস্ত লিপির লো। লো কেন, এবার তো ভাবীজি। হ্যাঁ, সেইদিন থেকেই ভাবীজি বলতে শুরু করেছিল।

সেদিন অবশ্য ও সম্বোধন করার বেশি অবসরই মেলেনি।

লিপির কথা থেকে লোকেশ যা ধারণা করেছিল তা বাস্তবের সঙ্গে মেলেনি। নিমন্ত্রিত শুধু সে একা নয়। পাড়া-বেপাড়ার এক পাল ছেলেও সেখানে নিমন্ত্রিত।

এরা কারা ?

লোকেশের একেবারে অচেনা তারা নয়। আর মুখগুলো অচেনা হলেও তাদের চরিত্রটা মুখ আর চেহারা দেখলেই যেন বোঝা যায়।

এদের আর একটু শিক্ষিত সংস্করণ তাদের কলেজেও সে এখন দেখছে।

চালচলনে চেহারায় কেমন একটা অস্বাভাবিক বেপরোয়া ঔদ্ধত্য। সে ঔদ্ধত্যের ওপরটা যত রুক্ষ আর উগ্র ভেতরটা তেমনি যেন কাঁচা ভিজে বলে সন্দেহ হয়।

দ্বিধা জড়িত ভীরুতাই যেন নিজেকে উল্টে দিয়ে উগ্র ঔদ্ধত্য সেজেছে! এসব ছেলেদের নিমন্ত্রিত হতে দেখে মনে মনে একটু উদ্বেগই বোধ করেছিল লোকেশ।

দেশের রাজনীতি তখন দুর্বোধ্য রক্তাক্ত ব্যক্তিগত হিংসার পথে পা বাড়াতে শুরু করেছে। এই গলির অন্য প্রান্তে ক'দিন আগে একটা আপাত উদ্দেশ্যহীন হত্যার ঘটনাও ঘটে গেছে। খবরের কাগজে সে-রকম ঘটনার বিবরণ এখানে ওখানে তো নিত্য পাওয়া যাচ্ছে।

এসব ছেলেদের সঙ্গে ওসব ঘটনার কোন সম্বন্ধ হয়তো নেই, কিন্তু ভাবীজির হঠাৎ এদের নিমন্ত্রণ করে দইবড়া খাওয়াবার উৎসাহ হল কেন ?

একটু ফাঁক পেয়ে লিপিকেই একবার সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিল, দইবড়ার এত ভাগীদার হবে তা তো ভাবিনি। এঁরা কি

তোমাদের বাড়ির নিয়মিত অতিথি নাকি ?

নিয়মিত নয়, অনিয়মিত—গম্ভীর হয়ে বলেছিল লিপি, তবে অতিথি হতে যাবে কেন, ওরা তো সব ভক্ত বাহন।

ভক্ত বাহন ! সত্যিই কথাটা বুঝতে পারেনি লোকেশ।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বাহন কাকে বলে জানো না ! লিপি হেসে এবার বুঝিয়ে দিয়েছিল, ওরা দেবীজির সেই রকম বাহন।

দেবীজি, মানে তোমার লো ! সত্যিই বিমূঢ় বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিল, লোকেশ, উনি এইসব ভক্ত জুটিয়েছেন ! কেন ?

তা আমি কি করে জানব ! তোমার ভাবীজিকেই জিজ্ঞাসা কোরো। কৌতুকের স্বরে বললেও লিপির গলায় একটা ভিন্ন সুরের আভাসও যেন পেয়েছিল লোকেশ। শুধু দইবড়া নয় লোভনীয় আরো কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা সেদিন ছিল।

ভাবীজি একটা স্কুলে টিচারী করেন লোকেশ জানত। সেই উপার্জনে এত দিলদরিয়া কেমন করে হ'ন একবার জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল লিপিকে।

কিন্তু লিপির মেজাজ বুঝে তা আর করেনি। লিপি যে প্রকাশ্যভাবে বিরক্ত বা বিরূপ তা নয়, মুখে তার অপ্রসন্নতাও কিছু দেখা যায়নি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়েছে খুশি মনেই সে এইসব অভ্যাগতদের পরিচর্যা করে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় যেন একটা বিষণ্ণ ঔদাসীন্য তারই মাঝে লোকেশ মাঝে মাঝে আবিষ্কার করছিল।

লিপি তাকেও যেন একটু এড়িয়ে চলছে মনে হয়েছিল লোকেশের।

সেটা নিশ্চয় তার মনের ভুল। কারণ ভক্ত বাহনরা চলে যাবার পরও ভাবীজির অনুরোধে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হয়েছিল লোকেশকে। শেষ পর্যন্ত চলে আসবার সময় লিপি নিজে থেকেই তার সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত যেতে চেয়েছিল।

কেন ? আমায় এগিয়ে দিতে ? আমি রাস্তা চিনতে পারবো না বলে ? —হেসে বলেছিল লোকেশ।

ভাবীজিই তাতে মৃদু বকুনি দিয়েছিলেন, আচ্ছা মানুষ তো তুমি। নিজে থেকে একজন যেতে চাইছে আর তাকে বাধা দিচ্ছ!

সত্যিই লজ্জিত হয়েছিল লোকেশ পাছে লিপি ভুল বুঝে থাকে সেই ভাবনায়। পথে একসঙ্গে যাবার সময় লিপি ভুল কিছু বুঝে থাকলে তা ভেঙে দেবে ঠিক করেছিল কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

তার নিজের মন তখন দুর্বোধ্য একটা আলোড়নে উদ্বেল।

আসবার আগে সারাদিনের পর সবে একটু ফুরসৎ পেয়েছিলেন ভাবীজি। গা-টা ধোবার তখনও সময় পাননি। শুধু হাত মুখ একটু ধুয়ে চুলটা একটু আঁচড়ে এসে লোকেশকে যাবার জন্যে তৈরি দেখে বলেছিলেন, সারাদিনে দুটো কথা বলবারও সময় পাইনি।

লোকেশ এ কথার কোন উত্তর দেয়নি। তার মৌনতাকেই যথেষ্ট অভিযোগ বলে হয়তো বোঝাতে চেয়েছিল।

আচ্ছা, সত্যি এতদিন আসনি কেন বল তো? জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভাবীজি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে।

এবার সত্যিই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করেছিল লোকেশ। অস্বস্তির সঙ্গে একটা শঙ্কিত অসহায়তা যেন মেশানো। মনে হয়েছিল ওই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাবীজি তার মনের ভেতরকার সত্যকার উত্তরটা যেন টেনে বার করবেন।

ভাবীজি নিজেই আবার ব্যাপারটা সহজ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আমার যেমন মরণ। একথা আবার জিজ্ঞাসা করছি, আসবার ইচ্ছে হয়নি তাই আসনি। এই তো সোজা জবাব পড়েই আছে। আচ্ছা, সত্যিই রাত হয়ে যাচ্ছে, আর দেরি কোরো না, এবার যাও। ভেবেছিলাম বাবা এলে দেখা করে যাবে। কিন্তু তিনি তো এখনও এলেন না।

ভাবীজির এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলেনি লোকেশ।

প্রশ্ন নয় একটা জ্বলন্ত উত্তর তার বুকের ভেতর থেকে তখন আসতে চাইছে। সেটা চাপবার জন্যেই তার এ নীরবতা।

সেই সময়েই লিপি বলেছিল, চল, তোমার সঙ্গে যাব বড় রাস্তা পর্যন্ত।

এতক্ষণে যেন মুখ খোলবার শক্তি পেয়ে লোকেশ ঠাট্টা করতে পেরেছিল লিপিকে।

ভাবীজির ভর্ৎসনার পর রাস্তায় যেতে যেতে কিন্তু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল আবার। তার নিজের মনে সেই দুর্বোধ্য আলোড়ন তখন চলছে।

জ্বলন্ত উত্তরটা ভাবীজিকে দেওয়ার ক্ষমতা থাকলে এ আলোড়ন কি শান্ত হত?

কিন্তু সে উত্তর কি দেওয়া সম্ভব?

দু'চোখের তারার অতলতা থেকে সে উত্তর ভাবীজি শুধু যদি উদ্ধার করতে পারতেন। তা একটু পেরেছিলেন কি? লোকেশের বুকটা কেঁপে উঠেছে সে সম্ভাবনায়। কম্পনটা শুধু আশঙ্কারই বুঝি নয়, তার সঙ্গে মেশানো আরো এমন কিছুর যা অনুভূতিটাকে একেবারেই ঠেলে রাখতে চায় না।

কি বুঝেছিলেন তিনি? বুঝেছিলেন কি যে গভীর অপরাধ বোধের গ্লানি থেকেই লোকেশ তাঁর সামনে আসতে ভয় পায়? মনের সেই গ্লানির দরুনই সে যে এতদিন প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে এখানে আসা বন্ধ করেছে তা বোঝা তাঁর পক্ষে সত্যি কি সম্ভব!

তিনি কি ভাবতে পারেন লোকেশের মনের পাপবোধের মূল কোথায়? লিপির সে প্রেমিক অথচ···অথচ এমন একজনের সান্নিধ্য তার রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয় যার দিকে চাইলে সবকিছুর সঙ্গে দেহটাকে সে লক্ষ্য না করে পারে না। সেই দেহ তার কাছে যে একটা উন্মাদনা এইটেই তার কাছে চরম লজ্জা আর গ্লানি। নিজেকে এই জন্যেই সে ক্ষমা করতে পারে না।

নিজের মধ্যেই সে মগ্ন হয়ে ছিল এতক্ষণ। লিপি সঙ্গে যেতে যেতে কি বলছে এতক্ষণে যেন তার কানে আসে।

তুমি এমন করে এতদিন ধরে এখানে আসা বন্ধ করলে তার একটা অন্য মানে হতে পারে তা কি বোঝ না!

কি মানে হতে পারে? সত্যিই একটু বিমূঢ় ভাবেই জিজ্ঞাসা করে

ছিল লোকেশ।

লিপি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলে, এখন থেকে আমার সঙ্গে এখানেই দেখা করতে হবে, বুঝেছ ?

না। বুঝলাম না।—একটু ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা ক'রে লোকেশ, তুমি কি তোমার বাবার দিক দিয়ে বলছ ? বাড়িতে না এসে শুধু বাইরে দেখা করলে তিনি একটু অশোভন ভাবতে পারেন ব্যাপারটা ?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিপি বলে, হ্যাঁ তাই। এ-বাড়িতে সেই জন্যেই তোমাকে আসতে হবে। বল—আসবে ?

না। বেশ দৃঢ় স্বরেই জবাব দেয় এবার লোকেশ।

না ? লিপির গলায় বিস্ময় বিহ্বলতা। তুমি সত্যি আসবে না ?

না ! তোমার বাবা যদি ভুল বোঝেন আমি নাচার। কিন্তু তোমাদের বাড়ি আর আমায় আসতে বোলো না কখনও। আমি আসব না।

এই শেষ কথা হয়েছিল সেদিন লিপির সঙ্গে।

বড় রাস্তাতেই তখন এসে পড়েছে। লিপি রাস্তার ধারেই যেন দারুণ একটা আঘাত পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল লোকেশকেও।

জায়গাটায় তেমন আলো ছিল না। তবু তার মুখের ওপর লিপির বিস্মিত বিহ্বল কাতর দৃষ্টিটা যেন তীব্রভাবে অনুভব করেছিল লোকেশ। কি আকুলতাই বুকের ভেতর জেগেছিল লিপিকে সব কথা বলবার। লিপিকে সত্যিই যদি বুঝিয়ে দিতে পারত তার এ অদ্ভুত সঙ্কল্পের কারণটা। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কিছুতেই সম্ভব নয়।

নীরবে দুজনে দুজনের কাছে বিদায় নিয়েছিল সেদিন।

লিপির মুখের দিকে শেষ মুহূর্তে চাইতে পর্যন্ত পারেনি লোকেশ।

ফিরে চেয়ে দেখেছিল অনেক দূরে এসে বাসস্ট্যাণ্ডটার কাছে দাঁড়িয়ে। লিপি অনেকক্ষণ বুঝি সেই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়েছিল। এই সবে চলে যাচ্ছে। দূরের স্বল্পালোকিত নির্জন রাস্তায় একটা কালো রেখায়

আঁকা ছবি।

কিন্তু সে ছবি বুকের ভেতর থেকে একটা কান্নার ঢেউ উথলে তুলতে চায়। তবু লিপির কথা সে রাখতে পারবে না।

নির্জন বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে মনে মনে সে বার বার উচ্চারণ করেছিল—আমায় আজ কি তুমি বুঝলে জানি না লিপি। কিন্তু একদিন হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারব কেন আর তোমাদের বাড়ি যাওয়া আমার সম্ভব নয়।

হায় অবোধ অসহায় মানুষ। তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা সঙ্কল্প অদৃষ্টের উপহাসের বস্তু। কখনও আর যাবে না সঙ্কল্প করেছিল লিপিদের বাড়ি। বছর মাস কি হপ্তাও সে সঙ্কল্প রাখতে পারেনি। গিয়েছিল তার পরের দিনই।

যেতে বাধ্য হয়েছিল। গিয়েছিল দুপুরবেলাতেই। বাড়িতে তখন হরিবাবু বা লিপি কেউ নেই।

বেশ কিছুক্ষণ দরজার কড়া নাড়ার পর ভাবীজিই এসে দরজা খুলে দিয়েছিলেন।

শুধু একটু মুখের দিকে সবিস্ময়ে চোখ তোলা। কোন সম্ভাষণ নেই। একটু হাসি পর্যন্ত নয়। এ যেন আরেকজন কেউ। দরজাটা ভেজিয়ে লোকেশের সঙ্গে ভেতরের দিকে যেতে যেতেই তার হাতের কাগজটা লক্ষ্যও করেছিলেন নিশ্চয়।

সেই ভাঙা মোড়াটার কাছে গিয়ে লোকেশকে বসবার ইঙ্গিত করে ভেতরের দিকেই নীরবে চলে যাচ্ছিলেন।

দাঁড়ান! বলেছিল লোকেশ।

ভাবীজি দাঁড়িয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু মুখে এবার যেন ক্ষীণ একটা বিদ্রূপের হাসি। গলার স্বরটাতেও তারই আভাস। বলেছিলেন, কি বলবে? ওই কাগজটায় যা পড়েছ তাই নিয়ে কিছু?

হ্যাঁ। শুনুন—লোকেশ কণ্ঠস্বরটা চেষ্টা করেও যেন নামিয়ে রাখতে পারেনি।

আচ্ছা শুনব'খন। তুমি বস। আমি আসছি। বলে ভাবীজি চলে গিয়েছিলেন।

বসতে পারেনি লোকেশ। ছোট উঠোনটাতেই পায়চারী করেছিল খানিকক্ষণ। তারপর তক্তাপোষটাতেই বসে পড়ে আবার কাগজটার সেই জায়গাটা পড়েছিল। একবার নয় বার তিনেক।

ভাবীজির তবু দেখা নেই। একটু অধৈর্যের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল লোকেশ। কি এত কাজ করছেন ভাবীজি! ইচ্ছে করেই আসছেন না ভাবতে সে চায় না। কিন্তু ভেতরে চলে যাবার আগে মুখের সেই আধা বিদ্রূপের হাসিটা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। লোকেশকে সেটা কি তার জায়গা চিনিয়ে দেবার ইঙ্গিত!—তোমাকে প্রশ্রয় যতটুকু দেবার দিয়েছি। কিন্তু তোমার সীমার বাইরে যেও না, এই কি সে ইঙ্গিতের ভাষা!

কিন্তু লোকেশ সে ইঙ্গিত মানতে পারবে না। তা পারলে এমন করে ছুটে আসত না আজ তার সমস্ত সঙ্কল্প জলাঞ্জলি দিয়ে।

অস্বস্তিটা কিন্তু ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছে। ভাবীজি কি আর বাইরে আসবেন না বলেই ঠিক করেছে! কি করবে এখন লোকেশ? এই তাচ্ছিল্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটা বুঝে নিজে থেকেই চলে যাবে?

তা কিন্তু যায়নি লোকেশ। কোনদিন যা করেনি তাই করে ছিল অদম্য আকুলতায়। সরু প্যাসেজটা দিয়ে রান্নাঘরে আর হরিবাবুর বসবার শোবার ঘরে একবার উঁকি দিয়ে দোতলার ঘরটাতেই উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে।

এটাই লিপি আর ভাবীজির শোবার ঘর সে জানত। কোনদিন কিন্তু এ ঘরে আসেনি। ঐশ্বর্য বিলাসের পরিচয় নেই। থাকার কথাও নয়, তবে মেয়েদের হাতের স্পর্শের শ্রীটুকু আছে।

সে সব অবশ্য তখন লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা নয়। কিন্তু যাঁর জন্যে এ অশোভন দুঃসাহস তিনি কোথায়? কোথাও তো নেই।

না, আছেন। বড় ঘরটার পাশে একটা ছোট ঘর। বই কাগজ টেবিল একটা টুল আর ছোট একটা তক্তাপোষ।

বড় ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল লোকেশকে। ছোট সরু তক্তপোষের ওপর বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে শোয়া ভাবীজির দেহটা চাপা কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে।

বুকের ভেতরটা কি যে করে উঠেছিল এখন চেষ্টা করলে বোঝাতে পারবে না লোকেশ। অদম্য সে শারীরিক আকুতি চেপে রাখবার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে ছুটে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল ঘর থেকে। ডাকতে চেষ্টা করেছিল একবার। গলার স্বরটা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সম্পূর্ণভাবে।

এরই মধ্যে তার উপস্থিতিটা যে ভাবেই হোক টের পেয়ে উঠে বসেছিলেন ভাবীজি। চোখের জল মোছবার চেষ্টা করেননি, আলুথালু বেশ ও মাথার চুলগুলো ঠিক করবার জন্যে হাতটা পর্যন্ত তোলেননি। ধরা গলায় বলেছিলেন শুধু, বোসো।

লোকেশ ছোট টেবিলের ধারের টুলটায় বসেছিল যেন ভাঙাচোরা কাঠের শরীর নিয়ে আড়ষ্টভাবে। হাতের কাগজটা তখনও তার হাতে আছে।

সেটা তার হাত থেকে এবার টেনে নিয়েছিলেন ভাবীজি। তারপর হঠাৎ উল্টো অভিযোগ করেছিলেন, কেন তুমি এ বাড়িতে এসেছ?

কেন এসেছি! সবিস্ময়ে বলেছিল লোকেশ, এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারছ? তুমি! সেই প্রথম তুমি সম্বোধনটা মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল নিজের অজান্তে। করবার পরও সচেতন হয়নি। ভাবীজিও লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানে না। তাঁর পরের কথায় অন্তত সে-রকম কোন চিহ্ন ছিল না। একটু রুক্ষস্বরেই বলেছিলেন, হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করছি। সে অধিকার আমার আছে! যে বাড়িতে পুলিশ আসে সার্চ করে জবানবন্দী নিতে, পুলিসের যার ওপর নজর, সে বাড়িতে তোমার মত লোকের আসার কি দরকার? সকালবেলা খবরের কাগজে সমস্ত খবরই তো পেয়েছিলে। পুলিসের ধারণা যারা রক্তাক্ত হিংসার পথ বেছে নিয়েছে, এ বাড়ি তাদের একটা গোপন আস্তানা। এখানে তারা আশ্রয় প্রশ্রয় দুই-ই পায়। তাদের সন্দেহ আমার ওপর, আমিই নাকি তাদের কাউকে এ পাড়ায়

সেই ভয়ঙ্কর গুপ্ত হত্যার দিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। তাদের সঙ্গে আমার গোপন যোগাযোগ আছে বলে তারা মনে করে। এ সব কথাই ছাপার অক্ষরে দেখেছ। তারপরেও কোন্ সাহসে এ বাড়িতে তুমি এসেছ? তোমার জীবন তোমার ভবিষ্যৎ সব কি তুমি এমনি করে নষ্ট করতে চাও?

দীর্ঘ একটানা কথার স্রোত থামবার পরও কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল লোকেশ।

তারপর যতদূর সম্ভব গলার স্বরটা সংযত রাখবার চেষ্টা করে বলেছিল, আমার কথা তো খুব ভেবেছ, কিন্তু নিজের কথা একটু ভাবলে ভাল হত না? পুলিসকে সন্দেহ করবার এ সুযোগ তো তুমিই দিয়েছ।

দিয়েছি? এবার ভাবীজির গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত শুনিয়েছিল। সেই সঙ্গে কৌতুকের মত একটা ঝিলিকও ফিরে এসেছিল চোখে।

সে সবের বিশ্লেষণ নিয়ে মাথা ঘামায়নি লোকেশ। দৃঢ় স্বরে বলেছিল, হ্যাঁ, তুমি তো সত্যিই ওদের প্রশ্রয় দাও। কাল যাদের নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়ালে, কে তারা? তাদের সঙ্গে কি তোমার সম্বন্ধ!

পাড়ার ছেলে। ছোট ভাইয়ের মত সব সম্বন্ধ।

না। কাতর হয়ে বলেছিল লোকেশ, কেন আমার কাছেও এমন করে সব গোপন করছ? ওদের আসল পরিচয় না জানো, ওদের ভেতর কারা যে থাকতে পারে তা না বোঝবার মত বুদ্ধির অভাব তো তোমার নেই। ওদের সঙ্গে সংশ্রব রাখবার কি তোমার দরকার?

সত্যিই কি দরকার—এবার হেসেছিল ভাবীজি, আচ্ছা, এবার তোমার উপদেশ মানবার চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি আর আমাদের এখানে এসে নিজেকে দাগী কোরো না। পুলিস আজ আমায় শুধু জেরা-টেরা করেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের নজর আমার ওপর থাকবেই। আমাদের এ বাড়িতে কারা আসে না আসে সব খবর তারা রাখবে। তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মিছিমিছি ওদের খাতায় তোমার নামটা উঠতে দেবে কেন? আমার সঙ্গই এখন ছোঁয়াচে জেনে এ বাড়ি আসা ছেড়ে দাও।

আমায় তো ছাড়তে বলছ, লোকেশ স্তব্ধ গলায় বলছিল, কিন্তু লিপি আর হরিবাবুর কথা ভাবছ কি ?

তাদের জন্য অত ভাবনা নেই। আশ্বাস দিয়েছিলেন ভাবীজি, তারা বাড়ির লোক তাদের বাধ্য হয়ে আমার সংশ্রব রাখতে হচ্ছে। কিন্তু বাইরের কেউ সে সংশ্রব রাখলে তার সম্বন্ধে অন্যরকম ধারণা হওয়া স্বাভাবিক।

তোমার সম্বন্ধে তাদের ধারণাটা যদি শোধরায়, লোকেশ সেই ক্ষুব্ধ স্বরেই বোঝাতে চেয়েছিল, তাহলে বাইরে থেকে কেউ এলে-গেলে তার গায়েও কোন দাগ লাগবে না। তুমি নিজে···

কথার মাঝখানে থামতে হয়েছিল লোকেশকে একটু অবাক আর একটু বুঝি অপ্রস্তুত হয়ে। লিপি কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টেরই পায়নি।

একবার ভাবীজি আর একবার লোকেশের মুখের দিকে তাকিয়ে লিপি লোকেশকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কতক্ষণ এসেছ ?

বেশীক্ষণ নয়। একটু অস্বস্তির সঙ্গেই বলেছিল লোকেশ।

বাইরের দরজাটায় আবার খিল ছিল না। শুধু ভেজানোই ছিল— ভাবীজির দিকে চেয়ে বলেছিল লিপি।

তাই নাকি—ভাবীজি একটু যেন অবাক হয়েছিল, লোকেশ আসবার পর খিল তাহলে দিতে ভুলে গেছি।

এক মুহূর্ত থেমে ভাবীজি আবার লিপিকেই জানিয়েছিল, লোকেশকে আর এখানে আসতে বারণ করছি। বলছি এখানে এখন আর ওর আসা উচিত নয়।

কেন উচিত নয় ? ইচ্ছে আর সাহস থাকলে আসবে না কেন ? প্রতিবাদটা স্পষ্টভাবেই জানিয়ে লিপি ওদিকের ঘরে চলে গিয়েছিল!

লিপি যা-ই বলুক,—ভাবীজি এবার আলুথালু চুলগুলো এলোখোঁপায় বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, আমি তোমায় এখানে আসতে মানা করছি।

আমিও আপনাকে···

যেন ভেতর থেকে একটা অদৃশ্য চাবুক খেয়ে থেমে গিয়েছিল লোকেশ।

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে প্রায় যেন নিজের মনে জড়িত স্বরে বলেছিল, আমি কিছু বলতে চাই না। বলতে পারব না, শুধু কাগজে এ-রকম খবর আর যেন পড়তে না হয়।

একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল ভাবীজির মুখে।

বলেছিল, পড়লে কি করবে বল তো? খবরটা তো ওর চেয়ে অনেক বিশ্রী হতে পারে। হতে পারে যে পুলিস আমাকে ধরে নিয়ে হাজতে পুরেছে, ভয়ঙ্কর কোন মামলার আমি আসামী হয়েছি। হাতে-নাতে কোন সংঘাতিক ব্যাপারে পুলিস আমায় ধরে ফেলেছে বলে দাবী করছে···

না! না! এ সব হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়···

তা তো নয়ই—ভাবীজিই হেসে বাধা দিয়ে বলেছে, আর দোষী হই বা না হই আমিও সাধ করে পুলিসের হাতে ধরা দিতে যাচ্ছি না। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। শুধু লিপির সঙ্গে বাইরের কোথাও দেখা কোরো এখানে আর এস না।

শেষের কথাটা বলার সময় গলাটা গাঢ় গম্ভীর আর একটু কম্পিত মনে হয়েছিল।

বিছানা থেকে উঠে পড়ল লোকেশ। রাত দেড়টার সেই গুড্‌স ট্রেনটা যাচ্ছে। রোজই নিয়মিত যায় বোধহয়। লোকেশের শুধু শোনার সুযোগ হয় না।

রেললাইনটা তার বাসা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। দিনের বেলা শহরের নিজস্ব হট্টগোলে চাপা পড়লেও রাত্রে সেখানকার গাড়ি চলাচলের আওয়াজ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গাড়ির আওয়াজের একটা বিশেষ যেন যাদু আছে। রাত্রির অন্ধকারকে তা যেন আলাদা একটা রহস্য স্পন্দনে অর্থময় করে তোলে।

তাদের মফস্বল শহরের বাড়িটাও ছিল রেললাইনের কাছে। ছুটি পেলে লাইনের ধারে ট্রেন দেখতে যাওয়া আর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে ট্রেনের

আওয়াজ শোনা তার মধুর বিলাস ছিল।

আজ কিন্তু মালগাড়িটার আওয়াজে সেই রহস্য মাধুর্য নেই। একটা বুক চাপা ভারের মত তা যেন অন্ধকারকে দলিত করে যাচ্ছে।

লোকেশ বেডল্যাম্পটা জ্বেলে কাঁচের কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেল। তারপর পাশের ঘরের দেরাজ খুলে নিচের একটা খোপ থেকে পাতলা একটা বাঁধানো খাতা বের করে নিয়ে এসে বিছানার ধারে বসেই সেটা খুলল।

বাঁধানো খাতাটা একটা ডায়েরী। বেশ অনেকদিন আগেকার। এ খাতাটা সহজে বার করে না লোকেশ। অনেকদিন অন্তত দেরাজের ওই নিচের খোপেই এটা বন্ধ ছিল।

বইটা বাঁধানো ডায়েরী হলেও ঠিক সেই ধরণে লেখা নয়। তারিখ-টারিখ কিছু কোথাও নেই। শুধু ছাড়া ছাড়া বিবরণ আর মাঝে মাঝে কিছু হয়তো উচ্ছ্বাস।

প্রথম যে পাতাটা লোকেশ খুলল, তার ওপরে কি যেন খানিকটা লিখে আবার কাটা আছে। যেমন তেমন করে কাটা নয়, বেশ ধৈর্য ধরে ঘন ভাবে কলমের আঁচড় কেটে কেটে লেখাটা একেবারে বাতিল করে দেওয়া। নিজস্ব গোপন ডায়েরী। বাইরের কারুর হাতে পড়বার কথা নয়, তবু যেভাবে লেখাটা কাটা হয়েছে তাতে মনে হয় নিজেকেও যেন ভবিষ্যতে এ লেখা পড়তে দিতে চায়নি। কি লিখেছিল এ জায়গায়? সত্যি ভাল মনে করতে পারছে না। একটা বিদেশী কবিতার কোটেশন ছিল এইটুকু শুধু মনে আছে।

সেকালে তাদের জগতের প্রিয় নানা কবিতার ছত্রের একটি।

'আরও একজন আছে নাম যার ধরি না কখনো—' লাইনটা এই ছিল বোধহয়। সে কবিতার উদ্ধৃতিটুকুর পর কি ছিল কিছুই বোঝবার উপায় নেই।

লোকেশ কাগজটা সোজা করে আলোর সামনে ধরে উল্টো দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করল। না, কিছুই বোঝা গেল না।

তারপর সেদিনকার আবহাওয়ার একটু বর্ণনা দিয়ে লেখাটা আরম্ভ হয়েছে।

কাল রাত থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তাঘাট তো এতক্ষণে খাল হয়ে আছে। আজ আর বেরুব না ভাবছি। বেরুবার কোন তাড়াও নেই। আজ বেশীর ভাগ জায়গায় কাজ হবে না। বৃষ্টির জন্য শুধু নয়। তা ছাড়াও বড় কারণ আছে।

মজুররা আজ তিন দিন হল কাজ বন্ধ করেছে। ধর্মঘট নয়। সবাই মিলে আসাই বন্ধ করেছে একসঙ্গে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হোক।

আজ একবার লিপির সঙ্গে দেখা করতে পারলে ভাল হত।

ক'দিন ধরে একবারও লিপির দেখা পাচ্ছি না। দেখা পাচ্ছি না, না দেখা দিচ্ছে না ইচ্ছে করে সেইটেই সন্দেহ হচ্ছে।

আজ একবার তার কলেজেই খবর নেব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা তো আর হবে না। লিপির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি, কিন্তু চুপি চুপি নিজের কাছে বলতে পারি যে দেখা হয়নি বলে একটা নিষ্কৃতির অনুভূতিই যেন হয়েছে। লিপির সঙ্গে দেখা হওয়াটা যতখানি চাইছি ততখানিই সেটা যেন ভয় করছি।

দেখা হলে কি কথা আমাদের হবে? আর সেই আগেকার দিনের সহজ ঘনিষ্ঠতায় ফিরে যেতে পারব কি?

ভয় হয়, কিছুতেই তা পারব না। মাঝখানে অদৃশ্য একটা দেয়াল কখন যেন গড়ে উঠেছে। এই কখন যেন গড়ে উঠেছে বলে অনিশ্চয়তার একটা ইঙ্গিত করাও তো নিজের সঙ্গে প্রতারণা। কখন গড়ে উঠেছে আমার অন্তত জানা উচিত। জানা উচিত কেমন করে তা গড়ে উঠেছে, ঠিক কোন্ মুহূর্তটিতে।

সেই যেদিন বাইরের উঠোনের দরজায় খিল দিতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, আর দোতলার ছোট ঘরটিতে লিপি এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের অগোচরে।

আমাদের বা লিপির আচরণে অস্বাভাবিক কোন কিছু এমন ছিল বলা

হয়তো ভুলই হবে। তবু লিপির তখনকার কথাগুলোয় অনেক কিছু ভাঙচুর হয়ে যাওয়ার একটা বঞ্চনাই যেন ছিল।

কেন উচিত নয়? আমার ও-বাড়িতে যাওয়ার সম্বন্ধেই বলেছিল লিপি, ইচ্ছে আর সাহস থাকলে নিশ্চয়ই আসবে!

কতদিন হয়ে গেল সে বাড়িতে তারপর থেকে আর যাইনি। যাইনি ইচ্ছায় না সাহসের অভাবে? কে সে জবাবদিহি চাইছে? চাইলেই কি দেব?

সে বাড়িতে যাইনি বটে কিন্তু প্রত্যেক দিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তর সয় না আজকাল। খবরের কাগজগুলো আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। তেইশ পল্লীর একটা আঁকা বাঁকা গলির পাড়ার কোন সংবাদ আছে কিনা?

এখনও পর্যন্ত কিছু পাইনি। পাড়াটা আবার যেন তার নগণ্যতায় হারিয়ে গেছে। তাই যাক।

আমার সেদিনের আবেদন কাউকে একটুখানি স্পর্শ করেছে কি? জানি না।

আমি কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে যেন কুল পাই না। একদিক দিয়ে তার এই স্বরূপ অবিশ্বাস্য রহস্যময়। কেন সে এ সবের মধ্যে নিজেকে জড়িয়েছে? এটা কি তার অকাল-বৈধব্যে বঞ্চিত ব্যর্থ জীবনের একটা বিদ্রোহের প্রকাশ? না তার চেয়ে গভীর যথার্থ কিছু?

নিজেদের ছোট বুক আর তার ছোট আশা আকাঙ্খা দিয়েই তার ভুল বিচার করছি না তো! কতখানি সে এসব কিছুর সঙ্গে জড়িত তাই তো ঠিক মত জানি না। আমার দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত একপাল ছেলেকে তার ওখানে সমাদরে নিমন্ত্রিত হতে দেখে এসেছি।

এ নিমন্ত্রণের মানে অত জটিল গভীর কিছু না-ও হতে পারে। পুলিস খানাতল্লাসী করতে এসেছিল এটা এমন খুব একটা সাংঘাতিক ব্যাপারই হয়তো নয়। পুলিসকে অমন অকারণে শুধু রুটিন হিসেবে বহু জায়গায় ঘা দিয়ে যেতে হয়। যদি কোথাও তা থেকে সন্দেহ করবার মত

ধ্বনি ওঠে।

ভাবীজি নিজে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটায় তাঁর সংশ্লিষ্টতা স্বীকার অস্বীকার কিছুই করেননি। কেন? এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে যাওয়াই আমার ধৃষ্টতা বলে?

এ ব্যাপারে যা সত্য লিপির অন্তত তা নিশ্চয় জানা উচিত। সেইজন্যেই তার সঙ্গে একবার দেখা করে সোজাসুজি এ প্রশ্ন করতে মন চায়।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। লিপির সঙ্গে অনেকদিন ধরে দেখা হচ্ছে না। দেখা যদি হয়ও তবু ও-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারব না।

কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারব কি?

তার চেয়ে সবই এখন থাক। সময়কে বয়ে যেতে দিই। আমরা দুর্বল অসহায় নির্বোধ। সব সমাধান সময়ের ওপরই ছেড়ে দিই।

ডায়েরীটার পাতা ওল্টাল লোকেশ। সম্পূর্ণ সাদা একটা পাতা। এ যেন সময়ের ওপর সব সমাধানের ভার দেওয়ার জন্যই মনের চেষ্টাকৃত শূন্যতার একটা ছবি।

কিন্তু তার পরের পাতায় এ কি! যেন বিমূঢ় বিহ্বল একটা আক্ষেপ। সেখানে উত্তেজনায় হাতের লেখাগুলোও বড় হয়ে গেছে।

সেখানে লেখা—লম্বা সময়ের সমাধানের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার হয়নি। লিপিই সেই সমাধান করে দিয়ে গেছে।

তেইশ পল্লীর সে গলির বাড়িতে যাইনি। লিপির কলেজেও না। গিয়েছিলাম হরিবাবুর সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করতে।

হরিবাবু কেমন অন্যমনস্ক বিহ্বল। আমায় দেখে প্রথমেই কি বলতে গিয়ে যেন থেমে গেলেন। বললাম, অনেকদিন আপনাদের ওদিকে যেতে পারি নি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই দেখা করে গেলাম। আপনাদের সব খবর ভাল তো?

হ্যাঁ ভাল! ভাল!—হরিবাবুকে যেন স্মরণ করে কথাটা বলতে হল—তুমি ভাল আছ তো? আগেরটা ছেড়ে এখন তো একটা নতুন জায়গায়

কাজ করছ। তাই না? শুনেছি খুব বড় কোম্পানি। লিপি যদি কলকাতায় একটা কাজ পেত—

অসংলগ্ন এলোমেলো কথা। কিন্তু চমকে উঠলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, লিপি কি কাজ খুঁজছে নাকি?

হ্যাঁ, খুঁজছিল এতদিন। এখন পেয়েছে। তবে কলকাতার বাইরে যেতে হল, অনেক দূরে, প্রায় পাড়াগাঁয়ে। হরিবাবু ধীরে ধীরে বিষণ্ণ গলায় বললেন।

কোথায় কি চাকরি করছে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম। কিন্তু কিছুই তা করিনি। আরও দু-চারটে ঘসা আলাপ করে চলে এসেছি।

চমৎকার! সময়ের কাছে এই সমাধানই কি চেয়েছিলাম!

পাতা উল্টে গেল লোকেশ। গোটা দুই শাদা পাতার পর যেন যৎসামান্য কালির ছিটে ছড়ানো ক'টা পাতা। যখন যা মনে হয়েছে ছাড়াছাড়া ভাবে লিখে গেছে এখানে সেখানে।

যা লিখেছিল অন্য কেউ পড়লে আবোল তাবোল ছাড়া আর কি ভাববে!

…কতদিন যাইনি! একদিন দুদিন নয়, পুরো একটি মাস এগারো দিন। দেহের ব্যথা তো জানি, কিছুদিনের পর তার অনুভূতিই অসাড় করে দেয়। মনের বেলা তা হয় না কেন? না যাওয়ার যন্ত্রণা দিনের পর দিন আরো তীক্ষ্ণ তীব্র হয়ে উঠছে। প্রত্যেক দিন সকাল হওয়ার সঙ্গে একটা কথাই সবার আগে মনে হয়—সারাদিন নিজের বিরুদ্ধে নিজেকে যুঝতে হবে। এই যে অসহ্য আকুলতা, কি নাম দেব এর?

হাজার হাজার বছর ধরে হাজার হাজার কবিতা যে লেখা হয়েছে সে কি এই অনুভূতি নিয়ে! কিন্তু সত্যি কোন দাম কি তার আছে? আকাশে মাটিতে পাতালে কল্পনার রাশ ছেড়ে দিয়ে যেমন দেবতা-যক্ষ-রক্ষ বানানো —এ কি তারই মত মূঢ় একটা ভ্রান্তি নয়?

যৌবন, কামনা যৌন আকর্ষণ এসব কিছুর যথার্থ ব্যাখ্যা তো জীব-

বিজ্ঞানই জানে, তার বাইরে এই যন্ত্রণার কোন সত্যকার মূল্য আছে কি। জৈব রসায়নের অতীত আর কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে একটি বিশেষ দেহের সাঁন্নিধ্যের উত্তাপই যাতে অন্য বিশেষ সত্তায় বিদ্যুৎ স্পন্দন আনে।

ডায়েরীটা মুড়ে ফেলল লোকেশ। নিভিয়ে দিল বেডল্যাম্পটা। ঘুম আজ আর বোধহয় আসবে না।

তার শোবার ঘরের পূর্বদিকে একটা ছোট বারান্দা। সেখান থেকে দেখবার মত কিছু নেই। একটা বাজার এলাকা। বহুদূর পর্যন্ত শুধু টিনের চালের রাজ্য।

তবু সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে রাত্রের অন্ধকারের একটু স্পর্শ পাওয়া যায়। শহরের গ্লানি মেশানো হলেও একটু খোলা হাওয়া গায়ে লাগে। আর দূরে সেই রেল লাইনের একটা সিগন্যাল দেখা যায় কুয়াশার রাত না হলে।

রাতটা আজ ঝকঝকে পরিষ্কার। সন্ধ্যাবেলা একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার দরুণই বোধহয় বাতাসটাও এখন স্নিগ্ধ।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াবার পর একটা কথা ভেবে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল লোকেশের মন। ক্ষুব্ধ তার নিজের ওপর। এসব যন্ত্রণার পাথার সে তো একবার পার হয়ে এসেছে। এই বিনিদ্র রাত, এই অস্থিরতা, এই সান্ত্বনাহীন বিলাপ সমস্ত হৃদয় জুড়ে। তবে আবার সেই অভিশাপ সাধ করে ডেকে আনা কেন?

অসহ্য হয়েছিল অবশ্য প্রথম আঘাতের পরের দিনগুলি! তেমন কাপুরুষ নয় বলে আত্মহত্যার কথা ভাবেনি। কিন্তু সব কাজ-টাজ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা সত্যিই ভেবেছিল!

জীবনের সাফল্য বিফলতার আর একটা অর্থ সে যেন তখন পেয়ে গেছে। জীবনে সাধনা করবার যদি কিছু থাকে তা হল দুঃখ না পাওয়ার সাধনা। সেই সাধনাই ভিন্ন পথে এবার করে দেখলে ক্ষতি কি—এই নিয়ে ছিল তখন তার নিজের সঙ্গে বোঝাপাড়া। কিন্তু এসব তো পরের অধ্যায়।

তার আগে ? তার আগে ধু ধু করা অবিরাম দাহের দিনগুলির মাঝখানে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত একটি মাত্র চিঠি।

সারাজীবনে তার কাছ থেকে পাওয়া একটি মাত্র চিঠি।

চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মাত্র ক'টি লাইন।

লোকেশ,

লিপি কাজ নিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে বোধহয় জানো। লিপির ঠিকানা নিচে দিলাম। ভুল যা করেছ তা সংশোধন করতে দেরী কোরো না।

—দেবিকা

চিঠিটা হাতে নিয়ে কতক্ষণ যে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল সে জানে না। এ চিঠির হাতের লেখার আঁচড়গুলিই যেন সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ কণিকার মত তার শিরায় শিরায় একটা শিহরণের স্রোত বইয়ে দিলে।

দেবিকা! ভাবী নয়, লো নয়, দেবিকা। এই তার নাম। এই নামেই একদিন সে ডাকবার অনুমতি দিয়েছিল। অনুমতি দেওয়ার চেয়েও বেশি কিছু করেছিল, অনুযোগ করেছিল নাম ধরে না ডাকার জন্যে।

কিন্তু চিঠিতে এসব কি সে লিখেছে! এই কি তার সব সমস্যার অব্যর্থ সমাধান? তার অন্তরের কথা কি এই? নিজে সে কি এই সমাধানে সত্যিই বিশ্বাস করে?

লিপি কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। লোকেশ তার কাছে একবার গিয়ে দাঁড়ালেই কি সব সমস্যা মিটে যাবে? জীবনটা কি পূজো সংখ্যার উপন্যাস? মিলনের ফরমূলায় মিলিয়ে দিলেই হল?

না, লিপির কাছে সে যাবে না। যাবে না কোনদিন। যাবে না, সে নির্মম হৃদয়হীন বলে নয়। এখনও সামান্য একটু মনুষ্যত্ব তার মধ্যে অবশিষ্ট আছে বলে যাবে না। লিপিকে আঘাত কতখানি দিয়েছে জানে না, সে আঘাতের ওপর অনুগ্রহের অপমান করবার মত অমানুষ সে নয়।

এরপর এই চিঠির প্রসঙ্গ নিয়েই সেখানে যেতে পারত। যাওয়ার হয়তো দরকারও ছিল। তা কিন্তু লোকেশ যায়নি।

শুধু কলকাতায় থাকা দুঃসহ হয়ে উঠেছিল বলে কিছুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাইরে চলে গেছে। বেশি দূরে কোথাও নয়। কাছাকাছি সাঁওতাল পরগণার একটা শহরে। চেঞ্জে যাবার পক্ষে সেটা অসময়। সে শহরে স্বাস্থ্যান্বেষীদের তাই ভিড় নেই। তার দরুণ সুবিধা যেমন তেমনি অসুবিধাও হয়েছে একটু। দু-একটা যা হোটেল সেখানে আছে তা চেঞ্জারদের মুখ চেয়ে বছরের ভাল আবহাওয়ার ক'টা ঋতুতে শুধু খোলা থাকে। অন্য সময়ে হোটেল খুলে রাখায় তাদের মজুরি পোষায় না। বিশেষ বর্ষাকালে তো নয়ই।

জায়গার অভাবে লোকেশকে তাই বেশ বিপদে পড়তে হয়েছে প্রথমে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা চুক্তি করে নিয়েছে অসময়ের জন্যে বন্ধ এক হোটেলওয়ালার সঙ্গে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সে নিজেই করে নেবে, হোটেলওয়ালা শুধু তাকে থাকবার ভাল ঘর দেবে জল, আলো ইত্যাদির আনুষঙ্গিক সুবিধার সঙ্গে।

সেই ব্যবস্থায় কয়েকটা দিন কাটাতে খুব কষ্ট কিছু হয়নি। দিনের বেলা বই পড়ে বা এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে রাত্রে হোটেলের ঘরটা শুধু শোবার জন্যে ব্যবহার করেছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছে স্টেশনের রেস্তোরাঁয়।

এই রেস্তোরাঁয় খাওয়ার ব্যবস্থা করাটার মধ্যেই বুঝি নিয়তির পুতুল নাচের সুতো টানার গোপন আয়োজন ছিল। দু-চারদিন এ-বেলা ও-বেলা খেতে খেতে আর দু-একজন নিয়মিত রেস্তোরাঁ-সেবীর আলাপ-আলোচনা শুনতে পেয়েছে।

নিজে সে কারুর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে যায়নি, তবু প্রবাসের দেখা-শোনায় সাধারণ নমস্কার বিনিময় কারুর কারুর বেলায় এক টেবিলে বসে একটু গল্প-গাছা করবার পর্যায়ে পৌঁছেচে।

এঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রৌঢ় রিটায়ার্ড একজন পুলিশ অফিসার। এ শহরে তাঁর নিজের বাড়ি। রিটায়ার করবার পর থেকে তাই সারা বছর এখানেই থাকেন, আর বাধ্যতামূলক বাসের গ্লানিটুকু কাটান

প্রতিদিন ছু'বেলা এই স্টেশনের রেস্তোরাঁয় এসে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে।

লোকেশের স্টেশনে যাওয়া শুধু খাবার জন্যে নয়। প্রথমে গিয়েই সে শেষ ডাকের খবরের কাগজ যে ক'টা পায় কিনে টেবিলে গিয়ে পেতে পড়ে।

এই ভাবেই পড়তে পড়তে সেদিন দূরের অন্য একটি টেবিলে কয়েকজনের উত্তেজিত আলোচনা কানে গেছে।

উত্তেজিত আলোচনার একমাত্র বিষয় তখন অবশ্য একটিই। প্রতিদিন কলকাতা শহর আর তার সব উপকণ্ঠ মৃত্যুর অনিশ্চিৎ সতর্কিত পদক্ষেপে অরণ্যের চেয়ে ভয়াবহ করে তুলছে তারই সংবাদ।

রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার ইতিমধ্যে এসে লোকেশের টেবিলেই বসেছেন। লোকেশ তাঁকে নমস্কার জানিয়ে ভিন্ন টেবিলের উত্তেজিত তর্কের বিষয়-টার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলেছে, ওঁরা কি সব বলছেন, শুনছেন? ক'দিনের কাগজে তো ওসব খবর পাইনি। তার মানে···

তার মানে খবরগুলো সব বানানো ফাঁপানো কাল্পনিক ভাবছেন? রিটায়ার্ড অফিসার বলেছেন, কিছু হয়তো তাই। কিন্তু সব নয়। আপনি তো শুধু কলকাতার কাগজ পড়েন দেখছি।

হ্যাঁ, তাতে কি সব খবর থাকে না! অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে লোকেশ।

থাকে। বলেছেন রিটায়ার্ড ভদ্রলোক, কিন্তু এদিকের খবর ঠিক পুরোপুরি সব সময়ে থাকে না। গতকাল পাটনায় যে ব্যাপারটা হয়ে গেছে তার খবর আপনার কলকাতার কাগজে কতটা বেরিয়েছে?

তা সবই তো বেরিয়েছে! লোকেশ কলকাতার হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে, একটা দল বুঝি নৌকা করে গঙ্গা পার হয়ে ওপারে পালাচ্ছিল। তাদের ধরতে গেলে পুলিসের সঙ্গে তারা রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ চালায়। একজন মারা গেছে আর ছুজন অত্যন্ত জখম হয়ে হাসপাতালে। তাদের মধ্যে একজন মর-মর। তাদের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে।

রিটায়ার্ড অফিসার হেসে বলেছেন, খবর যা বেরিয়েছে, তা ঠিক, আবার ঠিক নয়ও!

তার মানে? লোকেশ হেঁয়ালী করবার চেষ্টাটায় বিরক্ত হয়েছে।

মানে, এই যে,—ভদ্রলোক বুঝিয়ে বলেছেন; মৃত্যু আর জখম হয়ে হাসপাতালে যাওয়ার খবর প্রায় ঠিক। কিন্তু জবানবন্দী নেওয়ার খবরটা তা নয়। মরতে বসেও তারা কেউ কিছু বলেনি। পুলিস শুধু তাদের গা তল্লাসী করে গোপন সঙ্কেতে লেখা দু'একটা কাগজ পেয়েছে। এই কাগজগুলোই পুলিসের কাছে অমূল্য। এ খবরটা অবশ্য কলকাতা বা পাটনার কোন কাগজ জানে না।

লোকেশের ঈষৎ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করে ভদ্রলোক আবার বলেছেন, এ খবর আমিও জেনেছি ঘটনাচক্রে। কলকাতা থেকে যে অফিসার ওদের সনাক্ত করতে পাটনা গিয়েছিলেন তিনি ফেরার পথে এখানে নেমেছিলেন এখানকার রেলওয়ে পুলিশের কাছে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে যেতে। ভদ্রলোক এককালে আমার জুনিয়র ছিলেন। স্টেশনে আমি যেমন রোজ আসি তেমনি এসেছিলাম, আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় একসঙ্গে বসে কিছুক্ষণ এই ব্যাপারেই আলাপ হয়। তাতে আমি যা জেনেছি ও টেবিলের ওরা তাই নিয়ে চেঁচামেচি করছে।

তার মানে, ওঁরা যা বলছেন তা একেবারে বাজে কথা নয়, লোকেশের উত্তেজনাটা গলায় চাপা থাকেনি, পুলিস কিছু সঠিক নাম ধাম পেয়ে তাই ধরে কলকাতায় ধরপাকড় শুরু করে দিয়েছে?

শুধু তাই নয়, রিটায়ার্ড ভদ্রলোক নিজের উচ্চস্তরের বিজ্ঞতার গর্ব গোপন না করেই বলেছেন, কয়েকটা জায়গার গুপ্তঘাঁটির কথাও ওই সব কাগজ থেকে জানা গেছে। পুলিশ এখনও সে সব ঘাঁটির ওপর নজর রাখছে। সময় সুবিধা হলেই থাবা দেবে।

আচ্ছা,...আচ্ছা, দ্বিধা ভরে দুবার থেমে লোকেশ শেষ পর্যন্ত ভেতর থেকে উথলে প্রশ্নটা করেই ফেলেছে, সে-সব ঘাঁটি কোথায় কোথায় তা কিছু শুনেছিলেন?

ভদ্রলোক একটু হেসে বলেছেন, তা একটু-আধটু শুনেছি বইকি!

একটু চুপ করে থেকে ভেতর থেকে যেন সাহস সংগ্রহ করে লোকেশ এবার গলিটার নামটা জানিয়েছে। তারপর প্রায় অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করেছে, এই নামটা কি তার মধ্যে ছিল?

ভদ্রলোকও খানিক চুপ করে থেকেছেন। তারপর গম্ভীর ভাবে বলেছেন, ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে।

অসময়ের বেপোট ট্রেন। দুপুরে দুটোর পর ধরতে হয় তারপর কলকাতায় পৌঁছতে কমপক্ষে রাত সওয়া দশটা। তাও আবার হাওড়ায় নয় ব্যাণ্ডেল নৈহাটি লাইন ধরে শিয়ালদায়।

এই ট্রেনেরই একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় সেদিন দেখা গিয়েছিল লোকেশকে বেলা দুটোর পর। এর আগে আর কোন ট্রেনের সুবিধে থাকলে সে তাতেই যেত। ট্রেনে কেন, সুবিধে থাকলে সে প্লেনে যেতেও প্রস্তুত ছিল।

স্টেশনের রেস্তোরাঁয় যা শুনেছে আর রিটায়ার্ড পুলিস অফিসার যা বলেছেন তা হয়তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। কতটা তার খাঁটি খবর আর কতটা বাহাদুরি নেবার উদ্ভাবন তা সে বলতে পারে না। তবু ফিরে তাকে যেতেই হবে।

ট্রেনের ক'ঘণ্টার যাত্রাটা একটা নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা। প্রত্যেক কারণ অকারণের বিলম্ব যেন সবকিছুর বিরুদ্ধে হিংস্র একটা আক্রোশ ঠেলে তুলছে ভেতর থেকে। কাউকে এসব ত্রুটির জন্যে শারীরিক শাস্তি দিতে পারলে যেন সে খুশি হয়।

কামরাটা বড় কিন্তু যাত্রী মাত্র আর দুজন। তাঁরা যে যার বাঙ্কে নিদ্রামগ্ন না হলেও হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন। কেউ তাঁদের মিশুক ও আলাপী নয় এই লোকেশের ভাগ্য। মনের এ অবস্থায় ভদ্রতা বজায় রেখে আলাপ করা তার পক্ষে সম্ভব হত না।

জানালার বাইরে বর্ষার স্নিগ্ধ সবুজ প্রান্তরের চোখ জুড়ানো দিগন্ত।

তার মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ জলাভূমি আর তারই সঙ্গে সুরে মেলানো সাদা ডানা ঝলকানো বকের জটলা।

অন্য সময় হলে এই দৃশ্যই তার বিক্ষুব্ধ মনকে অনেকখানি শান্ত করতে পারত। কিন্তু আজ আর এ-সবের কোন আবেদনই নেই তার কাছে। নিজের বিরুদ্ধেই একটা অভিযোগের জেরা জবাব তখন তার মনের ভেতর চলছে।

সে মানা করেছিল কিন্তু কেন তা শুনতে গিয়েছিল লোকেশ? কি গরজ তার ছিল এ নিষেধ মানবার?

লিপির কথা ভেবেছিল। আত্মসংযমের দ্বারা নিজেকেই শাস্তি দিতে চেয়েছিল তার মনের অন্যায় আকুলতার জন্যে। কিন্তু তাতে লাভ হয়েছে কি? লিপিকে কি আঘাত থেকে বাঁচাতে পেরেছে? নিজে শাস্তি পেয়েছে, না দিতে পেরেছে কাউকে? কোন সমস্যার সমাধান কি হয়েছে শেষ পর্যন্ত?

হবে আশা করেছিল।

না, মিথ্যা সে কথা। এটা তার কাপুরুষতার একটা পঙ্গু কৈফিয়ৎ। যা সত্য তা সাহসের সঙ্গে তার স্বীকার করা উচিত ছিল। উচিত ছিল তার সমস্ত পরিণাম অকুণ্ঠিত ভাবে বরণ করবার। তখনও সময় বোধহয় ছিল। সবদিক দিয়ে এমন একটা সর্বনাশা বিপর্যয় হয়তো রোধ করা যেত।

ট্রেন যথারীতি দেরীতে শিয়ালদায় পৌঁছেচে। ভাগ্য ভাল যে লেটটা আরো বেশি হয়নি। এক এক দিন মাঝরাতেও এ ট্রেন নাকি পৌঁছায়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি পাওয়া একটা সমস্যা। লোকেশের সঙ্গে লাগেজের লটবহর নেই এই বাঁচোয়া। হাতে শুধু একটা ব্যাগ। কিন্তু তাই নিয়ে ট্যাক্সি না পেয়ে বাসে উঠলে কখন যে পৌঁছবে তার ঠিক নেই। ট্যাক্সি তাকে পেতেই হবে।

শিয়ালদা বলেই হোক, কিংবা অত রাত বলেই কিউ এর ব্যবস্থা নেই। ছুটোছুটি করতে হয়েছে ট্যাক্সির জন্যে। ছুটোছুটি করেও লাভ হয়নি। অন্য প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ঝগড়া পর্যন্ত করেও ট্যাক্সি জোটাতে পারেনি

লোকেশ···

ঘড়ির কাঁটা ওদিকে নির্মম ভাবে এগারোটার দাগ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। লোকেশ ওখানকার এক পাহারাদারের হাতে টাকা গুঁজে দিতে দ্বিধা করেনি এরপর। ট্যাক্সি তার চাই-ই।

ট্যাক্সি তারপর পেয়েছে। জোরে চালাবার কথা বলতে হয়নি ড্রাইভারকে। মৌলালীর মোড় ছাড়াবার পর ফাঁকা রাস্তা পেয়ে সে বেগ দিয়েছে যতখানি সম্ভব। বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে পড়ে আরো।

ভেতরে টান হয়ে বসে থেকেছে লোকেশ। কি দেখবে সেখানে গিয়ে? রিটায়ার্ড অফিসার স্টেশনের রেস্তোরাঁয় যার ইঙ্গিত দিয়েছেন তার যা হবার তা কি হয়ে গেছে? গিয়ে আর দেখাই কারুর পাবে না!

বড় রাস্তায় ট্যাক্সিটা ছেড়ে ব্যাগটা নিয়ে গলিতে ঢোকবার সময় থেকেই বুকটা কাঁপতে শুরু করেছে। না। গলিটা অন্তত শান্ত নির্জন।

একটু কষ্ট করে তারপর বাড়িতে ঢোকবার ছোট প্যাসেজটায় ঢুকতে হয়েছে। গলির এই কোণে একটা লাইটপোস্ট আছে। আজ যে কারণেই হোক সেখানে আলো নেই।

অন্ধকারে দরজাটা খুঁজে নিয়ে কড়া নেড়েছে। নেড়েছে একটু আস্তে আস্তেই। এত রাত্রে কড়া নাড়ার শব্দে সমস্ত পাড়াটাকে সচকিত করে তুলতে চায় না।

বেশ কিছুক্ষণ কোন সাড়া না পেয়ে শেষে কড়াটা জোরেই নাড়তে হয়েছে।

কড়া নাড়ার শব্দটা একটা যন্ত্রণা হয়ে বুকের ভেতরেই যেন তখন বাজতে শুরু করেছে। দেখা কি সত্যিই শেষ পর্যন্ত পাবে না নাকি?

না, দরজাটা অনেকক্ষণ বাদে খুলে গেছে। এ জায়গাটা প্রায় পুরোপুরি অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তবু কোন প্রশ্ন শুনতে হয়নি লোকেশকে। এক মুহূর্ত নীরবতার পরেই মৃদুকণ্ঠে বিস্ময়হীন আহ্বান শুনেছে, এস।

দরজাটা নিজেই ভেজিয়ে দিয়ে পিছু পিছু গিয়েছিল লোকেশ। অন্ধকার

উঠোন, সেই সঙ্কীর্ণ প্যাসেজ, তারপর সিঁড়ি। সামনে একটু শুধু শাড়ির খসখসানি আর ক্ষীণ পায়ের শব্দ।

সিঁড়ির খানিকটা উঠতেই ওপর থেকে সামান্য একটু আলোর আভা দেখা গিয়েছে। সামনের মূর্তিটা তাতে অস্পষ্ট আলোর পাড় দেওয়া একটা কালো রেখা-চিত্র, সিল্যুয়েট। হৃদয়ের অন্তহীন আকুলতা দিয়ে আঁকা।

সিঁড়িতে ওঠবার সময় আলোর আভা থেকে থেকে কাঁপছে লক্ষ্য করে যা মনে হয়েছিল ওপরে উঠে তার প্রমাণ পেয়েছে। বিদ্যুতের আলো নয়, ওপরের ঘরে একটা টেবিলের ওপর একটা মোমবাতি জ্বলছে।

তাও বেশিক্ষণ বোধহয় নয়। নিচে তার কড়া নাড়া শোনবার পর নামবার আগে এটা বোধ হয় জ্বেলে দেওয়া হয়েছে।

ওপরের ঘরে গিয়ে সেই আলোর টেবিলের অন্য ধারে ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাঁড়িয়েছে লোকেশের দিকে। সম্ভাষণ কিছু নয়, মুখে শুধু কেমন বিষাদে কৌতুকেমেশানো একটু হাসি।

কথা প্রথম লোকেশই বলেছে। উদ্বেগে উত্তেজনায় রুদ্ধকণ্ঠ শুধু একটু শিথিল করবার জন্যেই কথার কথা হিসেবে বলেছে, ওপরে তুমি তো এখন একা!

উত্তর যা পেয়েছে তা একেবারে অপ্রত্যাশিত, শুধু ওপরে নয়, সমস্ত বাড়িতেই।

জানালা দিয়ে আসা একটা দমকা হাওয়ায় কেঁপে ওঠা মোমবাতির আলোটা তার মুখে একটা রহস্য ছায়া যেন বুলিয়ে গিয়েছে।

সমস্ত বাড়িতেই একা? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছে লোকেশ, হরিবাবু কোথায়?

তিনি লিপির কাছে গিয়ে আছেন। এখানে তাঁর চাকরির এক্সটেনশন শেষ হবার পর আমিই পাঠিয়ে দিয়েছি।

আর তুমি! তুমি একলা এখানে আছ?

তাই তো আছি। বাড়িটা তো আমার। আমায় তো থাকতেই হবে।

আলোর শিখার কম্পনটা কি এতক্ষণে কণ্ঠেও লাগছে ?
না। লোকেশের কণ্ঠ কিন্তু আবেগে তীব্র হয়েও দৃঢ়।
এতদিন বাদে তুমি কি তাই বলতেই এসেছ আজ রাত্রে ?
কেন এসেছি তা কি তুমি সত্যিই জানো না, এখনও তা বুঝতে পারোনি ?
বুঝতে চাইলেও বিশ্বাস করতে পারছি না।
বিশ্বাস করতে পারছ না ! আর কি করে তোমায় বিশ্বাস করাব তাহলে ?
সমস্ত ঘরটা অস্থির আলোয় কেঁপে-কেঁপে যেন চোখের ওপর থেকে মিলিয়ে যাবে মনে হচ্ছে—কি করে বিশ্বাস করাব যে আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি। আজ এখুনি। এ সর্বনাশের খেলা আর তোমায় খেলতে দেব না।
বাতিটা হেলে পড়ে নিভে গেছে, লোকেশের অন্ধ আকুলতায় এগিয়ে যাওয়ার বেগে টেবিলটা আঘাত পেয়ে নড়ে ওঠাতেই বোধহয়।
বাইরে অন্ধকার, আর ভেতরে এক অবিরাম উদ্দাম স্পন্দনে শিহরিত চেতনা !
তুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে একটি সমর্পিত দেহকে নিষ্পেষিত করে সমস্ত কপাল গাল চোখ মুখ ক্ষুধিত অধরস্পর্শে ঢেকে দিতে দিতে লোকেশ কোন কথাই আর বলতে পারেনি। চায়ওনি বলতে।
রোমাঞ্চিত অন্ধকারই যেন তার বাহুবন্ধনের মধ্যে অসীম আবেগে মুখর হয়ে উঠেছে, লোকেশ ! লোকেশ ! তুমি কি আমার সবকিছু ভুলিয়ে দিতে চাও !
চাই ! তাই চাই। এবার বলতে পেরেছে লোকেশ,—আমি তোমার সব কিছু ভুলিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশে নিয়ে যেতে চাই, তুমি তৈরী হও, আমরা যাব।
বেশ তাই, নিজেকে ধীরে ধীরে লোকেশের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে সে বলেছে শান্ত গাঢ় কণ্ঠে, কিন্তু আজ নয়। এখন নয়। প্রস্তুত হবার আমার একটু সময় চাই। তুমি কাল এস। সকালেই।
আর প্রতিবাদ করেনি লোকেশ। ছোট লোভে কলুষিত করতে চায়নি

সমস্ত ভবিষ্যৎ। এই সিদ্ধান্তই মেনে নিয়ে চলে যাবার সময় শুধু বলে গেছে, আমার ব্যাগটা রেখে গেলাম। ওটা এখন ভার।

তার পরদিন সকালেই গিয়েছিল লোকেশ। সকাল হতে না হতেই। থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল গলিটায় ঢুকেই। ওধারে এধারে পুলিশের ছড়াছড়ি। ওই সকালেই এদিকে ওদিকে ভিড় জমেছে পাড়ার ছেলে বুড়ো অনেকের।

সংবাদটা তাদের কাছেই পেয়েছিল। তারপর যাচাই করেও নিয়েছিল একজন সহৃদয় অফিসারের কাছে। শুনেছে ভোরের আগে থেকে চারি-দিক ঘেরাও করে, গলিটির একটি বিশেষ বাড়ির খানাতল্লাসী সুরু হয়েছে!

কিছু পাওয়া গেছে কি?

পরে জানা যাবে।

ধরপাকড় হয়েছে কাউকে?

না। কাউকে পাওয়া যায়নি। বাড়িটা একদম ফাঁকা ছিল।

তারপর কয়েকটা বছর বিস্মৃতির গাঢ় যবনিকা টেনেই সে-সব মুছে দিতে চেয়েছে। পেরেছে কি? এদিকে রাজনৈতিক হাওয়া বদলেছে। নতুন দৃষ্টিতে সময়ের রায়ও হয়েছে ভিন্ন।

লোকেশ বিছানা ছেড়ে উঠেছে অনেকক্ষণ। মুখ চোখের তার যা চেহারা তাতে একটা নয়, অনেক বিনিদ্র রাত যেন সে কাটিয়েছে মনে হয়।

অন্য দিনের মত সব কিছু সে যান্ত্রিক ভাবে সেরে যেন কাজে যাবার জন্যেই তৈরি হচ্ছে। কিন্তু দৃষ্টি তার শুধু হাতের রিস্টওয়াচটায়। টেবিল ক্লকটার সঙ্গেও সেটা মিলিয়ে দেখছে বার বার।

তারপর যেন শামুকের পায়ে এগুলো। ঘড়ির কাঁটাগুলো দশটা পার হয়েছে। আর অপেক্ষা করতে পারেনি লোকেশ। ফোন তুলে ডায়াল করেছে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ওধারে কেউ ফোন তুলেছে।

না, কালকের সেই গলা নয়। দীর্ঘ কত বছরের ওপার থেকে অবিশ্বাস্য অতীতই যেন তাকে সম্ভাষণ করছে।

দেবিকা! চেষ্টা করেও গলাটা অকম্পিত রাখতে পারেনি লোকেশ।

ওদিকে খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর শান্ত গাঢ় কণ্ঠে—লোকেশ! আমি এরই অপেক্ষা করছিলাম। তারপর একটু হাসি, তোমার ব্যাগটা আমার কাছেই আছে।

তাহলে ঠিকানাটা বলে আর একটু অপেক্ষা কর—ব্যাগটা আমি আনতে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে তোমাকেও।

কিন্তু যাকে তুমি হারিয়েছিলে তাকে কি আর আমার মধ্যে খুঁজে পাবে?

না পাই ক্ষতি নেই। নতুন কাউকে তো পাব। লোকেশের পরিহাসের চেষ্টাটা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠের জন্যেই ভাল করে যেন ফুটতে পারেনি।

লোকেশ ফোনে ঠিকানা জেনে নিচ্ছে। ঠিকানাটা হয়তো ভুল নয়। কিন্তু তবু লোকেশ সেখানে ছুটে গিয়ে সত্যি কাউকে যদি না পায়!

আরো একজন চিরকালের বাহুবন্ধনে ধরা দেবে বলে কোথাও কারুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে কি?

৩

নির্মলাকে আমি হত্যা করেছি !

এরকম একটা রোমহর্ষণ উক্তি দিয়েও লেখাটা শুরু করা যেত। কিন্তু— সেটা তার নিজের কাছেই হাস্যকর লাগে।

পুলকেশ তাই লেখাটা শুধু আগাগোড়া কেটে দিলে। প্রথমে একটা ঢ্যাড়া টেনেই কেটে ছিল তারপর লাইন ধরে ধরে সমস্ত প্যারাটাই কাটাকুটিতে একেবারে অপাঠ্য না করা পর্যন্ত থামল না।

হচ্ছে না। কিছুতেই হচ্ছে না।

নির্মলাকে ভালো করে সে মনশ্চক্ষে দেখতেই পাচ্ছে না। কি রকম যেন স্পষ্ট হতে হতে আবার ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য ! যে মুখ তার মনের মধ্যে একেবারে বাটালি দিয়ে খোদাই হয়ে থাকবার কথা তা-ই এমন অস্পষ্ট হয়ে যায় কি করে কিংবা এইটেই বুঝি নিয়ম। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রেই ত অতি অন্তরঙ্গ একেবারে বুকের কাছের মানুষের মুখই কত সময় ঝাপসা হয়ে যায়। তার চলা-ফেরা পোষাকের খুঁটিনাটি সব কিছু চোখের ওপর ভাসে শুধু হারিয়ে যায় যেন তার মুখটি।

নির্মলার বেলা তা হওয়া অবশ্য উচিত নয়। নির্মলা ত বাস্তব জগতের কেউ নয়। সে পুলকেশের কল্পনা, যে কল্পনা তিল তিল করে সে বানিয়ে তুলেছে আজ এক যুগেরও আগে থেকে।

কল্পনা বলে সে ত বাস্তবের চেয়ে কম সত্য নয়। বরং বেশী। বিন্দু বিন্দু করে বহু বাস্তবতার নির্যাস চয়ন করে তার এ তিলোত্তমা কল্পনা গড়ে উঠেছে। সেখানে অস্পষ্টতার কোনো অবকাশ ত সত্যিই নেই।

পুলকেশ যেখানটা কেটে উড়িয়ে দিয়েছে তার আগের খানিকটা অংশ পড়ে দেখলে।

না, নির্মলা মহিমকে ফিরিয়ে দিলে না।—লিখেছে পুলকেশ, বাড়ির সবাইকে আর সবচেয়ে বেশী নিজেকেই অবাক করে দিয়ে ঘরের ভেতরেই নিয়ে এসে তাকে বসাল। নিজেই পাখার সুইচটা নামিয়ে দিয়ে বিস্তীর্ণ ফরাসের ওপর বসে একটা দুধের মত সাদা তাকিয়া মহিমের দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—পান খাবে ত!

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে চাকর রামচরণকে ডেকে গলির মোড়ের বেনারসী পানের দোকান থেকে স্পেশ্যাল চার খিলি পান আনতে হুকুম দিলে।

তারপর মহিমের চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে একটু কৌতুক মেশানো গলায় জিজ্ঞাসা করলে—বলো এবার কি বলতে চাও।

মহিম অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবেই তবু নির্মলার দিকে চেয়ে রইল।

কি বলতে এসেছে তাও নির্মলা ভালো করেই জানে। তবু মহিমের অত দ্বিধা কেন?

দেরী আর দ্বিধা ক'রে বললেই কি নির্মলার মন গলানো সহজ হবে? বলবে ত এই যে নির্মলা ফিরে চলো। তুমি যেমনটি চাইবে ঠিক তাই হবে। তোমার ওপর আর কোন কথা কেউ বলবে না, আমি ত নয়ই।

একথা কি আজ এই প্রথম বলবে মহিম? আগে দু-দুবার ত ঠিক এই দৃশ্যেরই অভিনয় হয়েছে। ঠিক এমনি করে মহিমের যেন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে মার্জনা চাইতে আসা। এমনি অনেক দ্বিধার পর যেন ভয়ে ভয়ে নিবেদন—ফিরে চলো নির্মলা।

নির্মলা দুর্বল, নির্মলা নির্বোধ, তাই সে শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি। মহিমের মুখখানার দিকে চেয়ে তাকে হতাশ করে বিদায় দিতে তার নিজের বুকটাই যেন ফেটে গিয়েছে।

কিন্তু দু-দুবারের পর আর তিনবার নয়।

নির্মলা জানে যে এবার গিয়েও প্রথমটা মহিম একেবারে অন্য মানুষ হয়ে যাবে। নির্মলা ছাড়া আর যেন কোন চিন্তা নেই।

চরিত্রের সম্পূর্ণ সংশোধনের মত আরো অনেক কিছুরই সংস্কার হয়ে

যাবে।

নির্মলার ড্রেসিং রুমে নতুন পর্দা। দেয়াল নতুন করে ডিসটেম্পার করা। মেরামত হওয়ার বদলে বসবার একটা নতুন গদী দেওয়া কেদারাই হয়ত দেখবে। আর মেক-আপের সস্তা দিশী মালের জায়গায় ম্যাকস্‌ফ্যাকটার ছাড়া আর কিছু নেই।

আর মহিমের ব্যবহার ?

তার ত কোন খুঁত ধরবারই থাকবে না।

কিন্তু ক'দিন এমন চলবে ?

বাইরে বেল ফুলওয়ালার ডাকে নির্মলার চমক ভাঙে।

দরজায় পর্দার ওধারে দাঁড়িয়ে বেল ফুলওয়ালা ডাকছে বেলফুল দেব দিদিমণি। খুব ভালো গোড়ের মালা আছে।

না লাগবে না। বলে বিদেয় করতে গিয়েও নির্মলা থেমে গেল। ও দুখিরাম ফুলওয়ালা কি মুখের 'না' শুনেই বিদায় হবে ? পর্দার আড়ালে ওকি আর চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে, পর্দার কোণ দিয়ে ঘরে কে আছে দেখা হয়ে গেছে ওর অনেকক্ষণ। গলার সুরটাই তাই একটু আলাদা।

এসপেশ্যাল এনেছি দিদিমণি। সব্বার আগে আপনার কাছে এয়েছি।

দুখিরাম পর্দার আড়াল আর মানতে পারল না। পর্দাটা একটু সরিয়ে চিম্‌সে আমসির মত মুখটুকু শুধু গলিয়ে দিয়ে ফোক্‌লা দাঁতের বিদঘুটে হাসি মাখিয়ে অনুমতি চাইল—আসব দিদিমণি ?

যেন প্রথম এই চোখে পড়েছে এইভাবে তারপর পর মুহূর্তেই অবাক হয়ে যেন আহ্লাদে আটখানা।

আরে ! মেজবাবু এয়েছেন যে ! কার মুখ দেখে সকালে যে উঠেছি !

মেজবাবুর দেখা পাওয়াই যেন দুখিরামের ছাড়পত্র। আর অনুমতির অপেক্ষা না করে সে অকাতরে ঘরে ঢুকে এল। তারপর জাজিম ঢাকা মোটা গদীর ঢালা বিছানার ধারে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে তার ফুল আর মালার ঝোলা ঘেঁটে কলাপাতার মোড়ক বার করতে করতে

শুরু করলে তার বাঁধা গতের বুলি।

এমন জিনিস আজ আর নিউ মার্কেটেও পাবেন না দিদিমণি। মেজবাবু আসবেন বলেই বুঝি আমার ভাগ্যে জুটেছে। এই ছুজোড়া রেখে গেলাম আর এই রজনীগন্ধার তোড়া ছুটো। ফুলদানিতে আমিই সাজিয়ে যাচ্ছি।

ছুখিরাম গোড়ের মালার জোড় ছুটো বড় রেকাবিতে রেখে রজনীগন্ধার তোড়া ছুটো নিয়ে ফুলদানিতে সাজাবার জন্যে উঠেই পড়ল।

ফুলদানিতে সাজিয়ে যাচ্ছি মানে!—মিথ্যেই একটু বিরক্তি জানিয়ে বললে নির্মলা—ফুল কি আমি নেব বলেছি, নিয়ে যাও ফুল। আজ ওসব লাগবে না।

ছুখিরামের আমসি মুখের তোবড়ানো গালে একটু হাসি দেখা দিল। এ কথার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজনবোধ না করে সে তখন বড় মানুষ-প্রমাণ আয়নাটার ছুপাশের ফুলদানিতে ফুল সাজাতে ব্যস্ত।

নির্মলা আর তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলে না। করা নিষ্ফল। মহিম মানে ছুখিরাম সমেত আর সবাইকার মেজবাবু এলে এ বাড়ির কি দস্তুর তা ছুখিরাম ভালো করেই জানে। বকুনি ঝকুনি ধমকেও সে কাবু হবার নয়। পয়সার জন্যেও সে এখন দাঁড়াবে না। সে জানে বখ্‌শিসের সঙ্গে দাম তার মজুতই থাকবে যখন দরকার নেবার জন্যে।

এক হিসেবে ছুখিরামের উপদ্রবটায় একটু খুশি হওয়াই উচিত। খানিকটা তবু সময় পাওয়া গেল মহিমকে এবার যে জবাবটা দেবে তা মনে মনে একটু গুছিয়ে নেবার।

মহিমেরও এতক্ষণে নিজের আর্জির নিষ্ফলতা বোঝা উচিত।

তাই বুঝে যদি নিজেই নিজেকে সংবরণ করে নেয় তাহলে সব চেয়ে ভালো। তাহলে আর কোন বিশ্রী অস্বস্তির ব্যাপার হবে না।

পুরোনো লোক। অনেকদিন বাদে যেন একবার ঢুঁ মেরে যেতে এসেছে। তার উচিত মত খাতিরই নির্মলা করবে। রামচরণকে দিয়ে তবলচি ডাকাবে, ডাকাবে ওপরের বড় সুশীলাকে গান গাইবার জন্যে। তেমন

মরজি হলে নিজের পায়েও ঘুঙুর বাঁধতে পারে। এতদিন বাদে এ পাড়াতেই তাহলে সাড়া পড়ে যাবে। নির্মলা নাচছে। দুখিরামের ত তাহলে পোয়া বারো। ঝুলি খালি করে ফুল দিয়েও কুলোতে পারবে না। ধার করে আনবে স্যাঙ্গাৎ কারুর কাছ থেকে।

শুধু দুখিরাম কেন, রামচরণেরও আজ মুখে হাসি ফুটবে। রাখুর দোকান থেকে নিউ কেবিন পর্যন্ত ছোটাছুটিই করতে হবে অমন বিশবার। যত ছোটাছুটি তত দস্তুরি তার ওপর বখ্‌শিস ত আছেই।

হ্যাঁ, রীতিমত সেই তখনকার মাইফেলই বসিয়ে দেবে একদিনের জন্যে মহিমের খাতিরে। বাড়ির সবাই অবাক হয়ে যাবে নিশ্চয়। নির্মলার ঘরে এ আবার কি কাণ্ড! গত দশ মাস কেউ সে ঘরের সাড়া-শব্দই পায়নি। হঠাৎ হল কি!

সেই মেজবাবু এসেছে যে,—কেউ নিশ্চয় বলবে।

মেজবাবু আবার এল?—কেউ ভুরু কোঁচকাবে।

ঢুকতে দিলে নিমি?—কারুর চোখ কপালে উঠবে।

আবার তাহলে নিমি সেই ফাঁসে গলা দিলে!—কারুর মুখে শোনা যাবে বোধহয়।

না, নির্মলা সে পুরোনো ফাঁসে আর গলা বাড়াবে না। আর যাই করে করুক। তেমন মনে হলে কলকাতা ছেড়েই চলে যাবে কিছুদিনের জন্যে। সেবারে যেমন গেছল।

রামচরণ পান এনেছে। রূপোর রেকাবিতে সাজিয়ে ধরে দিয়েছে তাদের সামনে।

কাছেই থাকিস রাম, এক ডাকে যেন পাই। রামচরণ চলে যাবার সময় জানিয়ে দিলে নির্মলা—আমি একটু বেরুব।

বেরুবে—এই প্রথম মুখ খুলেছে মহিম। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছে কোথায়?

কোথায় তা কি করে বলবে নির্মলা। কিছু কি ঠিক করে বলেছে নাকি? হঠাৎ মুখ ফস্কে কেন যে কথাটা বেরিয়ে গেছে নিজেই ঠিক

জানে না।

হয়ত নিজের অজান্তেই ভেতরের একটা উদ্বেগ ওই ভাবে প্রকাশের রাস্তা খুঁজে নিয়েছে।

উদ্বেগটা কিসের, কেন?

উদ্বেগ নিজের জন্যে, নিজের মনের জোর সম্বন্ধে। মনের অগোচর কিছু নেই। ভাসা মনে না হোক ডোবা মনে কি নির্মলা জানে যে শেষ পর্যন্ত মহিমকে সে 'না' বলে বিদায় দিতে পারবে না।

মাইফেলই বসাক আর অন্য যা কিছু দিয়েই মনটা ভুলিয়ে রাখুক মহিম যত বেশীক্ষণ থাকবে ততই সেই পুরোনো বাঁধনগুলো আরো শক্ত হয়ে উঠবে। সেগুলো ছিঁড়ে গেছে মনে করাই হয়ত তার ভুল। সেগুলো ছেঁড়েনি শুধু একটু ঢিলে হয়ে আছে মাত্র।

মহিম তা হয় ত জানে। জানে বলেই সে অমন নীরবে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে তার কুহকটাকে ভালো করে ছড়াবার সময় দেবার জন্যে।

কিন্তু কোথায় যাবে তার একটা উত্তর ত দিতে হয়।

নির্মলা প্রথমটা এমন একটা মুচকি হাসি মুখে ফুটিয়ে রাখল যেন এ প্রশ্নটা উত্তর দেবার মতই নয়।

মহিম আবার জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সত্যি বেরুবে?

হ্যাঁ, একটু যেতে হবে—নির্মলা অস্পষ্ট উত্তরের সঙ্গে একটু আশ্বাসও না দিয়ে পারলে না,—ব্যস্ত হবার কিছু নেই, দেরী আছে এখনো।

কিন্তু রাত্রে আবার যাবে কোথায়? মহিম যেন সেই আগেকার অধিকার নিয়েই প্রশ্ন করলে।

নির্মলার বুকটায় একটু অস্ফুট ব্যথা বাজল কি। মুখে কিন্তু কপট রাগের ঝাঁঝ দেখালে—কোথায়, কেন, অত সব তোমায় বলতে যাব কেন?

মহিম এ রাগের ভান গ্রাহ্য করলে না। গম্ভীর হয়েই বললে।—আর কাকে তাহলে বলবে?

আচ্ছা, আচ্ছা তোমাকেই বলছি—নির্মলা বলবার মত একটা জায়গা তখন ভেবে ফেলেছে—যাবো একটু মায়ের বাড়ি। অমাবস্যার পূজো ত আজ। তাই দিয়ে আসব। নাও হল।

মহিম চুপ করে থাকায় নির্মলা আবার বললে—তুমিও চলো না। কতকাল ত একসঙ্গে যাইনি।

বলেই নির্মলা নিজের মারাত্মক ভুলটা বুঝতে পারলে। মুখ ফসকে কেন যে অমন কথাটা বার হল ভেবে তখন তার নিজের ওপর রাগ হচ্ছে।

মহিমকে অবহেলা, অপমান করবে না নিশ্চয়, কিন্তু তাকে নিয়ে বাড়াবাড়িরও ত কোন মানে হয় না। পাছে মহিমের মনে লাগে সেই ভয়ে সে নিজের গলায় ফাঁস দেবে নাকি!

মহিম কিন্তু নির্মলার এই ভুলটার সুযোগ নেয়নি। সে তখন একটু যেন দুঃখের সঙ্গেই বলেছে—আজ আমার যাওয়ার উপায় নেই। এখান থেকেই থিয়েটারে যেতে হবে। ওরা বসে থাকবে আমার জন্যে।

কে বসে থাকবে—ধর মশাই আর ন্যাটা মুখুজ্যে?—নির্মলার গলা রূঢ় হয়ে উঠল এবার—তা অত যদি তাড়া তাহলে এখানে এসেছ কি করতে? ধন্য করতে পায়ের ধুলো দিয়ে?

মহিমের মুখে একবার একটু হাসি ফুটল—কেন এসেছি তা বলবার মুখ আমার সত্যিই নেই নির্মলা। আমার এই আস্পর্ধার উপযুক্ত জবাব পেয়েই যে ফিরে যেতে হবে তাও জানি। তবু না এসে পারলাম না।

একটু চুপ করলে মহিম। নির্মলার দিকে কয়েক মুহূর্ত একদৃষ্টে চেয়ে থেকে তারপর ধীরে ধীরে বললে—আমায় দেশ ছেড়ে পালাতে হবে নির্মলা, নয় জালিয়াতির জন্যে জেলে যেতে হবে।

সে কি আমার অপরাধ?—নির্মলা তখনও কঠিন হবার চেষ্টা করছে। যা বলতে এসেছ আমি তাতে রাজী হলেই কি তোমার সব আপদ কেটে যাবে?

যাবে নির্মলা !

মহিম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললে নির্মলা হয়ত বিরূপ হয়ে উঠত। কিন্তু মহিমের গলায় উচ্ছ্বাস নেই। তা গাঢ় শান্ত।

নির্মলার বুকের ভেতরটা কেন এমন মোচড় দিয়ে ওঠে।

সে কঠিন হবার চেষ্টা করলে, চেষ্টা করলে তার যা পেশা সে জীবনের সমস্ত নির্দেশ স্মরণ রাখবার। পুরুষ মানুষ শঠ, কপট, স্বার্থপর। কখনো তাদের ছলনায় ভুলবে না। মায়া যেন না জন্মায় কারুর ওপর।

জপমন্ত্রের মত এই শিক্ষাই ত জ্ঞান হবার পর থেকে দিয়েছে দিদিমা মা মাসিমা। তাদের পেশা ত এক পুরুষের নয়।

না, নরম হওয়া কিছুতেই চলবে না। হাতের যে নখ কেটে ফেলেছে মায়া দয়া টানই বা কিসের তার ওপর ?

নির্মলা গলাটা যতখানি সম্ভব তেতো করে বললে, তবে আর কি ! আমি গেলেই যদি সব মুস্কিল আসান হয়, তাহলে তু করে ডাকো আর আমি লেজ নাড়তে নাড়তে চলে যাই। পোষা কুকুর যদি না হই তাহলে তোমার কাছে কেনা বাঁদির বেশী ত কিছুই নই।

বলতে বলতে নেশাতেই নির্মলার মেজাজ আরো গরম হয়ে উঠল, গলা আরো রুক্ষ—তোমার মায়ের বাড়ি যাবার সময় নেই। যাবে কি করে ? লোকে দেখলে তোমার মাথা কাটা যাবে যে। দেখেছ, দেখেছ, লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে চকবাড়ির মহিম মজুমদার একটা বেবুশ্যের সঙ্গে মার বাড়ি এসেছে···

আঙুল দিয়ে কাকে দেখাবে, আর কি বলবে—মহিমের মুখে অত্যন্ত দুঃখের হাসি ফুটে উঠল—তা তুমি ভালো করেই জানো। চকবাড়ির নাম এখানকার কেউ শোনেনি, মহিম মজুমদারকেই চেনে না কেউ। আঙুল দিয়ে তোমাকেই দেখিয়ে তারা বলবে, ওই দেখ নির্মলা রায়ের সঙ্গে একটা ভেড়ো এসেছে···

চোখে জল আসতে চায়, বুকের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে। তবু এ দুর্বলতার কাছে হার মানবে না নির্মলা।

আরো কঠিন আরো তিক্ত হয়ে উঠল তাই।

লোকলজ্জার ভয় যদি না থাকে, তোমায় যদি নাই কেউ চেনে তো আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি কিসের? ওঃ। কথা দিয়ে এসেছ যে তোমার ল্যাংবোটদের। তোরা বোস, এই যাবো আর আসবো। ওর চাবিকাঠি তো আমার হাতে। মুখে কিছু বলতেও হবে না। একবার গিয়ে দাঁড়ালেই সুড় সুড় করে চলে আসবে···

নির্মলা! অনুচ্চ অথচ যন্ত্রণাকাতর গলায় মহিম একবার বাধা দেবার চেষ্টা করলে।

নির্মলা থামল না। দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার না করেও তীব্র গলায় বললে—তুমি দেশান্তরী হও, আর জেলেই যাও তাতে আমার কি? পুরুষ চরানো আমার পেশা। তার বদলে তুমি-ই আমায় চরিয়েছ। আখের মাটি করে দিয়েছ আমার। তোমার জন্যে কিসের আমার দরদ। এসেছ বোসো, আর পাঁচজন যেমন আসে তেমনি ফুর্তি করে চলে যাও। আজ যে এসেছ তার টাকাটাও দিয়ে যেতে ভুলো না!

নির্মলা শেষ কথাটুকু বলে ঘর ছেড়েই বেরিয়ে চলে গেল।

মহিম তখনও স্তব্ধ হয়ে বসে।

হতাশ হয়ে তাকে ফিরতে হবে জেনেই তার জন্যে এক রকম প্রস্তুত হয়ে সে এসেছিল। কিন্তু নির্মলার এরকম ব্যবহার এরকম কথা কল্পনা করতে পারেনি।

নিজেকে সামলাতে যেটুকু লাগল সেই দুই-এক মিনিটের বেশী মহিম অপেক্ষা করল না। পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে তা থেকে না গুনেই গোটা পাঁচেক নোট তার এতক্ষণের হেলান দেওয়া তাকিয়াটা চাপা দিয়ে রেখে যখন চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন দুখিরাম আবার এসে ঘরে ঢুকল।

ওকি চলে যাচ্ছেন নাকি মেজবাবু! দুখিরাম স্তম্ভিত। দিদিমণি কোথায়?

কোন উত্তর না দিয়ে তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে

মহিম বেরিয়ে গেল।

পুলকেশ থামল।

মাথাটা যেন গুলিয়ে গেছে। যা লিখেছে তার মধ্যে এতক্ষণ যা পড়ল তাও কি কেটে বাদ দিয়ে দেবে ?

তাহলেই ত আবার সব গোড়া থেকে শুরু করতে হয়।

শুধু তাই নয়, নির্মলাকে যেভাবে যে অবস্থায় দেখাতে চায় সেইটেই ত বদলাতে হবে। না, তা চলবে না। নির্মলাকে তার সত্যকার পটভূমিকার যথার্থ পরিবেশের মধ্যে না দেখতে পারলে তাকে বোঝানোই অসম্ভব।

তাকে গোড়া থেকে বাহারী টবে বসিয়ে দিলে রুচি যদি বাঁচে আর সব কিছু মিথ্যা হয়ে যাবে।

মনটা শুধু একটু যা খুঁত খুঁত করছে, তা পরিবেশটা পুরোপুরি ফোটাতে পেরেছে কিনা সেই সন্দেহ।

ওই যে একটা বিচিত্র সাজানো জীবনের জগৎ। দিনের আলো নিভে আসার সঙ্গে কোন যাদুকরের ছোঁয়ায় ঘুমন্ত পুরীর মত যা জেগে ওঠে, তার হাওয়াই যেন আলাদা। গোলকধাঁধার মত সর্পিল অথচ আলোয় ঝলমল সে গলিগুলোয় ঢুকলেই নিঃশ্বাসে যেন একটা তিক্ত মধুর অস্ফুট ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

হাজার চেষ্টা করেও ক্লেদ ও গ্লানি মেশানো সেই স্থূল আবেশের আবহাওয়া কি ফোটানো সম্ভব !

ইয়ামা দি পিট-এর কথা মনে পড়ছে।

না, সেখানেও কিসের যেন অভাব বোধ করেছিল যাওয়ার সময়। রংগুলো যেন একটু কড়া করে চাপানো হয়েছে, যেমন গ্লানির কালিমা তেমনি ভাবালুতার গোলাপী আভার খেলায়।

পুলকেশ তা চায় না। সে নির্মলাকে নির্লিপ্ত স্রষ্টার দৃষ্টিতে দেখতে চায়।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার হাসি পায়। নির্লিপ্ত স্রষ্টা! সোনার পাথর বাটি। স্রষ্টার পক্ষে নির্লিপ্ত হওয়া যেন সম্ভব ?

কেন সম্ভব নয়? তর্ক করবে অনেকেই—স্রষ্টা থাকবে সুদূর হয়ে। নিজেকে সৃষ্টির সঙ্গে জড়াবে কেন? তার অনুরাগ ত নেই, বিরাগও নয়, না দণ্ড না পুরস্কার, বিচারই সে করতে বসেনি ; যা যেমন দেখছে তাকেই রূপ দেওয়া তার কাজ।

শুনতে বেশ! কিন্তু সরষের মধ্যেই যে ভূত! দেখার চোখের মধ্যেই তার বিচার যে অলক্ষ্যে ছাপ দিয়ে রেখেছে।

না, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে নয়, দেখতে চায় সেই স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যার মধ্যে কোনো দিকে কোনো ফাঁকি নেই। পাল্লায় কোনো দিকেই সে পাষাণ চড়াতে চায় না। নৈতিক শুচি-বায়ুগ্রস্তদের সে নাকে কাপড় তোলাতেও চায় না, তার বর্ণনায় চোখের জলও ফেলাতে চায় না ভাবে গদগদ পাঠকদের। শুধু ছবিটা যেন যথাযথ হয়। অন্ততঃ এমন ধারণা যেন না হয় যে, নির্মলা যে জীবন থেকে উঠে এসেছিল, কোনো অবিশ্বাস্য দৈবানুগ্রহে সেখানকার কদর্য ক্লেদ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

নির্মলা নামটা দেওয়ার কিছু পরেই তার একবার খট্‌কা লেগেছিল। নামটা এই ভেবে ঠিক করতে চেয়েছিল যে, খুব সেকেলে যেন না হয় আবার আধুনিকও নয়।

কয়েকবার ব্যবহারের পরই হঠাৎ নামের অসঙ্গতির কথাটা খেয়াল হয়েছিল। হঠাৎ নির্মলা নামটাই সে রাখতে গেল কেন? নিজের অগোচরে কোনো ভাবনা তার মনে কাজ করেছে? নির্মলা নামের ভেতর দিয়ে তার অচেতন মন কোনো প্রচ্ছন্ন উপহাস কি জাগিয়ে রাখতে চায়? না, অত গভীর কোনো ব্যাখ্যাকে সে আমল দিতে চায় নি। নেহাৎ আকস্মিকভাবেই নামটা এসে পড়েছে।

বিনোদিনী কুমুদিনী গোছের সেকেলে নাম গোড়ায় ভেবেছিল, কিন্তু সময়টা অত পেছনে ফেললে যে মুস্কিল। ইতিহাসের তাল সামলাতে আসল গল্পের হাল যে ধরে রাখা যাবে না। বিনোদিনী কুমুদিনীদের জগৎ থেকে এ নির্মলাকে বার করে আনাও অসম্ভব হত। সমাজের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধনগুলো তখনো ছিল অটুট। বিনোদিনীদের পক্ষে দান-ধ্যান করে

মঠ মন্দির বসিয়ে কাশীবাসের বেশী কোন ভবিষ্যৎ ছিল না। কোনো নির্মলার পক্ষে সেদিন নিজের পরিচালনায় নিজের দল নিয়ে ইউরোপ আমেরিকা জয় করে আসার কথা কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

পুলকেশের যেন চমক ভাঙে। নির্মলার ওই ভবিষ্যৎই সে ধার্য করে রেখেছে নাকি? রাখেনি ঠিক, তবে ধার্য করলেই বা দোষ কি? তার কল্পনায় যে নির্মলা জন্ম নিয়েছে সে ত হার মানতে জানে না! তা ছাড়া নির্মলার সত্যকার হার জিৎ এই সম্পদ আর খ্যাতির জগতের সাফল্য-বিফলতা নিয়ে ত নয়।

তা কি নিয়ে? পুলকেশ নিজের কাছেও এখনো তা যেন স্পষ্ট করে তুলতে চায় না।

জীবনের নদী বইছে, বইতে দাও তার প্রবাহের ধর্ম মেনে। তার বাধা তার বাঁক সব একে একে পেছনে ফেলে যেতে যেতে যে সমুদ্র-সাধ তার মধ্যে জাগবে তা আগে থাকতে অনুমান করবার চেষ্টা করার প্রয়োজন কি?

নির্মলার মত মেয়ে ত আমার আপনার প্রতিদিনকার চোখে দেখা, কেউ একটু মিটি মিটি কেউ আবার ঝলমল-দের দলের কেউ নয়।

মেয়েরা সমানে পাল্লা দিচ্ছে আজ পুরুষদের সঙ্গে, সে কথা না মেনে উপায় নেই। তারা ডাক্তার উকিল ইঞ্জিনিয়ার বৈজ্ঞানিক হচ্ছে, পাহাড়ে চড়ছে, প্যারাসুট বেঁধে শূন্যে ঝাঁপ দিচ্ছে নিশ্চয়ই। তবু নির্মলার মত নিয়তি আর তার মত দুর্বার বেগ নিয়ে এলে জীবন তাকে কোন পরম জিজ্ঞাসার অকূলে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় তা কি আদম সুমারির পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়? নির্মলা পুলকেশের অলীক অবাস্তব নিছক কল্পনাও ত নয় যে তার বিবর্তন ও পরিণাম একটা পূর্ণবৃত্ত কাহিনীর উপাদান মাত্র হবে।

নির্মলাকে পুলকেশ দেখেছে আর তাও একজনের মধ্যে নয়। বিশেষ করে তাকে জেনেছে অবশ্য এমন একজনের মধ্যে যাকে চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য পুলকেশের হয়নি। কোন দিনই হবার নয়। চাক্ষুষ না দেখলেও

সেই একজনই পুলকেশের কাছে সব চেয়ে বড় ও জীবন্ত চ্যালেঞ্জ।

আমাকে ব্যক্ত করো, ব্যাখ্যা করো বাইরের এই বিচিত্র ঘটনা, সমারোহের অন্তরালে খুঁজে বার করো আমার নিঃসঙ্গ অন্তরের আর্তি! রাগ প্রতিভা স্বাস্থ্য। জীবন আমায় কি না দিয়েছে, খ্যাতি অর্থ প্রতিপত্তি, কি আমি পাইনি? তবু আমি কৈশোরের সরলতায় একদিন যে মঠবাসিনী ভিক্ষুণী হতে চেয়েছিলাম, মনে করেছিলাম প্রব্রজ্যার চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কোন পথ নেই, সেই আকুতিই কি ফিরে ফিরে জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া বিস্বাদ করে দিয়েছে? পারো, পারো কি আমায় নিজের কাছে চেনাতে?

পুলকেশ কত কাল আগে এই প্রার্থনা শুনেছিল তার মনের মধ্যে! প্রার্থনা নয়, দাবী! সেই দাবীই চ্যালেঞ্জ।

কোথা থেকে জীবনীটা হাতে এসে পড়েছিল। বিশেষ কোনো আগ্রহ না নিয়েই শুরু করেছিল পড়তে। তারপর তন্ময় হয়ে গিয়েছিল শুধু পড়াতেই নয়, তারই সঙ্গে ভাবনায়। মনকে তীব্র ঔৎসুক্যে ধরে রাখবার মত কাহিনী ; কিন্তু সমস্ত বিবরণের পেছনে সত্যকার সেই নারী সত্তাকে দেখতে পাচ্ছে কি? এই ছিল নিজের কাছে জিজ্ঞাসা।

আশ্চর্য একটি জীবন। সাফল্য বলতে যা বুঝি তারই শিখর থেকে শিখরে এক বিজয়িনীর অবিশ্বাস্য অবিরাম গৌরব অভিযান।

কিন্তু আরম্ভ হয়েছিল কোথায়? দাসী বৃত্তিই যার জীবিকা এমন এক দরিদ্র পরিচারিকার জীর্ণ ঘরে। সে পরিচারিকা মা নয় ধাত্রী। প্রকৃত মা নিজের বিলাস-জীবনের বিড়ম্বনা এড়াতে প্রথম যৌবনের অবৈধ প্রেমের সন্তানটিকে এই ধাত্রীর কাছে রেখেছিলেন।

সে ধাত্রী দাসী তখন থাকে গ্রামাঞ্চলে। সেখান থেকে বিয়ে করে সে শহরে এল। স্বামী একটা পুরোনো ভাঙ্গাচোরা ভাড়াটে ব্যারাক-বাড়ির দারোয়ান। একটি সংকীর্ণ স্যাঁৎসেঁতে জীর্ণ ঘর, স্বামী-স্ত্রীতে সেই মেয়েটিকে নিয়ে সেই ঘরেই থাকতে হয়।

দাসী ধাত্রী শহরে এসে মেয়েটির মার খোঁজ করেছে অনেক। খুঁজে

পায় নি। পাবে কি করে। বিলাসী সমাজের যেখানে চলাফেরা সে জগতের সঙ্গে তার মত পরিচারিকার পরিচয়ই নেই।

মেয়েটির সেখানে কষ্টের সীমা নেই। দিন দিন সে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কিন্তু এত দুর্দশা মেয়েটির ত হবার কথা নয়। সত্যিই যার সে কন্যা, মায়ের সে প্রথম যৌবনের প্রণয়ী, মাকে ফেলে চলে গেলেও মেয়েটির কথা ভোলে নি। মেয়ের জন্য তখনকার পক্ষে বেশ যথেষ্ট সংস্থানের, প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার, ব্যবস্থা সে করে দিয়ে গিয়েছিল। সে টাকায় ব্যাঙ্কের সিন্দুকেই ছাতা ধরত যদি না একদিন সকাল বেলায় সেই পাঁচ বছরের মেয়েটি অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসত।

মোটরের যুগ তখনও শুরু হয় নি। রুগ্ন শীর্ণ একটি বছর পাঁচেকের মেয়ে সেদিন রাস্তার ধারে করুণ মুখে বসে আছে। তখনকার অত্যন্ত উঁচুদরের এক আমিরী গাড়ি সেখানে এসে থামল। ঘোড়ার ল্যাজের কি গলদ শোধরাতে কোচোয়ান গাড়ি থামিয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন চেহারায় পোষাকে ঝলমলে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা।

হঠাৎ রুগ্ন শীর্ণ ভিখিরীর মত চেহারার মেয়েটা ছুটে গিয়ে মাসি, মাসি বলে সেই মহিলাকে জড়িয়ে ধরলে। সেই সঙ্গে কান্না—আমায় নিয়ে যাও মাসী। এরা আমায় ধরে রেখেছে।

মহিলা যেমন অবাক তেমনি বিরক্ত। তার দামী সিল্ক সাটিনের পোষাক মেয়েটা নোংরা হাতে ধরে চটকে নষ্ট করে দিয়েছে। ধাত্রী আর তার দারোয়ান স্বামী এসে জোর করে মেয়েটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ায় মহিলা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে ঘরে বন্দী করে রাখা হল। কিন্তু সমস্ত বিশ্বের মুগ্ধ বিস্ময় যে একদিন জাগাবে, দরজায় তালা দিয়ে রাখলেই ঘরে বন্ধ হয়ে থাকবার মেয়ে সে নয়।

কোচোয়ান তখনও গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে পারে নি। চার কি বড় জোর পাঁচ বছরের নোংরা রুগ্ন শীর্ণ মেয়েটা ঘরের আধভাঙা জানলায় উঠে তার ভেতর দিয়ে রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁধের হাড় সরে গেল হাঁটুর

মালাইচাকি ফাটল কিন্তু মেয়েটা এবার সত্যিই গিয়ে পৌঁছলো খানদানী পাড়ায় তার মায়ের বড় মানুষী বাসায়।

নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন অবশ্য সেই মহিলাই। মেয়েটি ভুল করে নি। চার বছরের মেয়ে ঠিকই তাঁকে চিনেছে। সত্যিই তিনি মেয়েটির মাসি। মায়ের যা পেশা তাঁরও তাই।

নাটুকে কাণ্ড করেই চার বছরের মেয়ে তার জীবনের ধারা সেদিন বদলে দেয়।

নির্মলারও কি তেমন কিছুর দরকার হয়েছিল?

না, জীবনের ধারা তার পাণ্টাবার দরকার হয়নি। ভাবেও নি সে-কথা।

দিদিমা তখনও বাড়িওয়ালী হয়নি। থাকে অবশ্য আধ-গেরস্ত পাড়ায় বেশ ভালো একটা দোতলার বাসায়। মা কিন্তু সেখানে থাকে না। দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসে মা নির্মলাকে নিয়ে যে পাড়ায় তখন থাকে সেখানে বেশীর ভাগই টিনের চালের মাঠ-কোঠা। একটু বর্ষা হলে সরু গলির রাস্তার কাদায় পা ডুবে যায়। কাদের একটা ভাঁটিখানার পচা গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে থাকে বেশীর ভাগ সময়ে।

কত বয়স তখন নির্মলার?

বড়জোর ছয়-সাত হবে। সে বয়সে তুনিয়ার বিচারই হয় আলাদা চোখে। ভাঁটিখানার গন্ধ খারাপ লেগেছে কিন্তু তার জন্যে জীবন তুর্বিষহ মনে হয় নি। নোংরা জল-কাদার গলিতে থপ-থপ করে পা ফেলে কাদা ছিটিয়ে ফ্রকে কাদা মাখিয়ে ছুটোছুটি করতে ভালো লাগে। মার বকুনি, হাতের চড়-চাপড়টা খারাপ লাগে তখনকার মত। তারপরেই ভুলে যেতে দেরী হয় না। গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তার বেগুনি ফুলুরির দোকানে সকালে একবার যাওয়াও ত একটা উত্তেজনা।

ফুলুরি ভাজে কানা বুড়ি। সামনে অবশ্য কেউ কানা বুড়ি বলে না। বলে রতনের পিসী। রতনের পিসীর নির্মলার ওপর একটু বেশী পক্ষপাত। পয়সা নিয়ে যা দেবার তার ওপর ফাউ দেয় একটা-আধটা। ওখানে

কানা বুড়ি ছাড়া আরেক আকর্ষণও আছে। ফকিরদা।

সবাই বলে ফকিরদা। বাপ-ছেলে সবার কাছে ওই এক পরিচয়। মাঝে মাঝে আসে। কানা বুড়ির তেলে ভাজার দোকানের এক পাশে একটা নড়বড়ে বেঞ্চি পাতা। ফকিরদা সেখানে এসে বসে থাকে। নিজে কখনো খায় না। ডেকে ডেকে যাকে তার ইচ্ছে হয় খাওয়ায়।

দাও ওই গণ্শাটাকে চার পয়সার ফুলুরি দাও।

হ্যাঁ, গণ্শাকে চার পয়সার ফুলুরি দেবে—কানা বুড়ি খেঁকিয়ে ওঠে, —গণ্শার কি ফুলুরি জোটে না। ওর বাপ ডকের গুদোমে কাজ করে। এই এক টাকার বেগুনি ফুলুরি আলুর চপ কিনতে পাঠিয়েছে।

ও সব ওর বাপ নিজে আর ওর তথা ইয়ার বন্ধুরা খাবে। সকালবেলাই মৌতাতে বসেছে বুঝতে পারছিস না!—ফকিরদা সবজান্তার মত তার ভারী কর্কশ গলায় বলে—গণ্শার ভাগে শুধু থাকবে ঠোঙ্গাটা। দাও গণ্শাকে আগে দাও।

গণ্শাকে যেমন তেমনি রাস্তার অচেনা অজানা কাঙাল ভিখিরীকেও।

ফকিরদা কালে-ভদ্রে আসে। কিন্তু এলে এরা সব যেন গন্ধ পায়। কিংবা রোজই থাকে তক্কে তক্কে। এলেই এসে ছেঁকে ধরে। ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ অন্ততঃ জন দশেক। ফকিরদা সকলকেই খাওয়ায় না।

এই বুড়ো! তুই আবার এসেছিস যে। বললাম না সেদিন ফাঁসির খাওয়া খেয়ে যাবি, আর এমুখো হবি না। আর তুই ছুঁড়িটা ভালো করে চান করে আয় তবে খেতে পাবি।

মেয়েটার গায়ে একটা চিমটি কেটে ফকিরদা বলে—ইস্ তিন পুরু কাতরানি উঠল যে, যা যা চান করে আয় সাবান মেখে; এই নে সাবানের পয়সা।

ফুলুরি না খাইয়ে সত্যিই চার আনা পয়সা বার করে দেয় ফকিরদা সাবানের জন্যে।

তাকেও চিমটি কেটে ছিল ফকিরদা সেই প্রথম দিন। আরে গোলাপ-কুঁড়ি যে, কিরে মাংস কই গায়ে। বেগুনি ফুলুরি খেয়ে কি হবে!

দুধ খা। তোর মা দুধ খাওয়ায় না কেন? এমন ফুট ফুটে গোলাপ-কুঁড়ি মেয়েটা কাকতাড়ুয়া হয়ে যাবে যে!

তারপর কোনদিন বলেছে—ইস ফ্রকটা কে দিয়েছে রে তোকে! ঘর মোছা ন্যাতা সেলাই না কি রে! এই দেখ। পছন্দ হয়?

সত্যিই সেদিন ফকিরদার হাতে কটা ভারী সুন্দর ফ্রক ছিল, একটা একটা করে দেখিয়েছিল নির্মলাকে। দেখিয়েছিল শুধু, দেবার কথাও বলে নি। নির্মলারও লোভই হয়েছিল খুব। সেগুলো পরবার কথা ভাবতেও পারেনি।

ফকিরদার কি জামা কাপড় ফ্রক ফিরির ব্যবসা নাকি! না তা নয়। কি যে ফকিরদার ব্যবসা কেউ তখন জানত না। চোয়াড়ে পাকানো কিন্তু সেই সঙ্গে রীতিমত ডাকাতের মত চেহারা। মুখে একটা চালাক-চালাক হাসি। কানা বুড়ির বেঞ্চিটার ওপর এসে বসে থাকত যেন বাদশাহী মেজাজে। নির্মলা দোকানে গেলে সারাক্ষণ তার সঙ্গেই যেন খুনসুটি করত নানা মজার কথা বলে।

আজ সকালে কি চুরি করে খেয়েছিস? হ্যাঁ, নিশ্চয় খেয়েছিস চুরি করে, নইলে কানের ডগা লাল কেন?

নির্মলা রাগের ভান করে ছেলেমানুষী জবাবই দিয়েছে—ইস! বললেই হল কানের ডগা লাল; কই লাল?

দেখ না তুই নিজে; কানটা টেনে দেখ। গম্ভীর হয়ে বলেছে ফকিরদা।

ও আমি যেন বুঝি না।—নির্মলা পাকা বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, আমায় দিয়ে কান ধরানো হচ্ছে।

এ সব মজার ঠাট্টা করে তার প্রতি মনোযোগটা সেই বয়সেই নির্মলা বুঝতে আর পছন্দ করতে শিখেছে। ফকিরদা সেই জন্যেই একটা আকর্ষণ। সবাই যাকে খাতির করে, ভয়ও করে বুঝি, সেই ফকিরদা শুধু তার সঙ্গেই ফষ্টিনষ্টি করবে এটা কি কম কথা নাকি?

সেই ফকিরদাকে একদিন পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

নির্মলা নিজে দেখেনি, তবে যারা দেখেছে তাদের মুখে শুনেছে।

ফকিরদাকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছল। ফকিরদা নাকি ছেলেধরা। তার একটা মস্ত দল আছে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের লুকিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় না কোথায় চালান করে দেয়।

গণ্‌শাটাকে কিছুদিন ধরে যে পাওয়া যাচ্ছিল না সেও নাকি ওই ফকিরদার কাজ। তাকেও সেই রকম চুরি করবার মতলব ছিল না কি ফকিরদার ?

সেদিন সন্ধ্যের পর বড় রাস্তার মুদিখানা থেকে বাড়ির দু'তিনজনের ফরমাসে কারুর দুটো দেশলাই কারুর এক পো ডাল কারুর যেন ক'টা ধূপকাঠি কিনে নিয়ে ফেরবার সময় গলিতে ঢোকবার মুখে ফকিরদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তাদের বাড়ির পাঁচ ঘরের এমন দোকানে যাওয়ার ফাই-ফরমাস নির্মলা খুশি হয়ে নিজে থেকেই খাটে। বিশেষ করে মা যেদিন মুজরোয় যায় সেদিন তো বটেই।

তাদের গলিতে কোনদিন ফকিরদাকে কিন্তু দেখেনি। বিশেষ করে অমন সময়ে। তাকে দেখে ফকিরদাই যেন অবাক হয়েছিল বেশী।

আরে গোলাপ-কুঁড়ি! তুই এই গলিতে থাকিস ?

বাঃ, তুমি যেন জানো না!—নির্মলা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, তুমি তো সব জানো।

তারপর নিজে থেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল—তোমার হাতে ওটা কি ?

ফ্রক! দেখেছিস কি সুন্দর!—ফকিরদা ফ্রকটা দুহাতে খুলে ধরেছিল—ওখানে লটারিতে পেলাম।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ফ্রকের বাহারটা ভালো করে বোঝা যায়নি অবশ্য। লটারি শুনেও নির্মলা তার সাত বছরের বুদ্ধি দিয়েই প্রথমটা অবিশ্বাস করেছিল।

ধেৎ, ফ্রকের বুঝি আবার লটারি হয় ? লটারি করে ত বিস্কুটের। নম্বর

লেখা টিনের চাকতি ঘুরিয়ে বিস্কুটের লটারিই নির্মলা দেখেছে।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি—ফকিরদা যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলেছিল, চ তোকে দেখাচ্ছি। দুটো পয়সা আছে ত? না থাকে আমিই দেব 'খন আয়।

নির্মলা যেতে পা বাড়িয়েছিল।

যাওয়া কিন্তু হয় নি। তাদের বাড়ির মানদা মাসি তখন সাজগোজ করে গলি দিয়ে আসছে। মুজরো টুজরো নয়, রোজ এমন সময় মানদা মাসি সাজগোজ করে কোথায় যায় কে জানে! ফেরে অনেক রাতে। কোনদিন ফেরেই না।

মানদা মাসি তাকে দেখে বকুনি দিয়েছিল।—ও ছুঁড়ি! তুই এখানে আড্ডা দিচ্ছিস! আর ওরা হা-পিত্যেশ করে বসে আছে। যা, শিগ্‌গির যা বাড়ি।

ফকিরদাকেও বকতে ছাড়েনি মানদা মাসি।—ওকে অত আহ্লাদ দিও না ফকিরদা, ও এমনিতেই যা বিচ্ছু হয়ে উঠেছে।

ফকিরদা তাকে ফ্রকের নিলাম না দেখিয়েই চলে গিয়েছিল। নিলামটার টোপে তাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়াই কি ছিল ফকিরদার মতলব? মানদা মাসির চোখে পড়ে যাওয়ার দরুণই আর সাহস করেনি? খুব বাঁচা তাহলে বেঁচে গেছে!

বিদেশী মেয়েটির মত তার এটা ভাগ্য বলতে হবে। হঠাৎ সে জমকালো বুড়িটা তাদের রাস্তায় না থামলে বিদেশিনী মেয়েটি হয়ত ওই দাসী আর দারোয়ানের ঘরেই শুকিয়ে মরত একদিন।

মানদা মাসি না এসে পড়লে তাকেও কোথায় চালান করে দিত কে জানে? কি রকম হত সে জীবন ভাবলে নির্মলা শিউরে ওঠে। তারপরেই একটু হাসি পায় তার। চুরি হওয়ার নামে অত তার শিউরে ওঠার সত্যি কিছু আছে কি! তার মত মেয়েকে মেরেও তারা ফেলত না!

জীবনটায় তারপরই অনেক পরিবর্তন এসেছে তা ঠিক।

মা তার কোন ভালবাসার লোকের জন্যে দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছিল। সে ভালবাসার লোক যথারীতি নেশা কাটলেই

একদিন নিঃশব্দে কেটে পড়েছে। মা এখানে সেখানে মুজরো নিয়ে কিছুদিন যথাসাধ্য চালাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছে তাকে। যে ক্ষয়রোগ মায়ের কাল তার লক্ষণ তখনই দেখা দিয়েছে। মার শরীর দিন দিন কাঠি হয়ে আসছে তখন। গলার কাশি আর সারতে চায় না। এই কেশো রোগীকে কে দেবে মুজরোর বায়না। নির্মলাকে নিয়ে মাকে একদিন ফিরে যেতে হয়েছে দিদিমার কাছে। দিদিমার তখন বরাত খুলেছে। যার কাছে শেষের দিকে ছিল সে ও-পাড়ায় একটা বাড়িই কিনে দিয়ে গেছে দিদিমাকে। দিদিমা আধা গেরস্থ ভাড়াটে বসিয়ে বাড়িওয়ালী হয়েছে।

মা সেখানে গিয়ে বেশীদিন বাঁচেনি। মা বেঁচে থাকতে থাকতেই নির্মলাকে অবশ্য তখন স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। বেশ ভালো স্কুল। পড়ানোর যা খরচ তাতে যে-সে সেখানে মেয়ে পাঠাতে পারে না।

স্কুলে যাবার পর নির্মলা সাধারণ মাপের যে নয়, তা বোঝা গেছে। সব দিকে তার সহজ পটুতার পরিচয় পেয়ে মাস্টার-মাস্টারনিরাও খুশি। নির্মলাকে তার বাড়ির পরিচয় নিয়ে কখনো লজ্জা পেতে হয়েছে না কি!

না তা হয় নি। স্কুলের কর্তৃপক্ষ হয় অত্যন্ত উদার, নয় তাঁরা কিছু জানতে পারেন নি। ক্লাশের মেয়েদের প্রশ্ন অবশ্য শুনতে হয়েছে—হ্যাঁরে তোর বাবা কোনোদিন আসে না কেন রে? ফি বছর তুই প্রাইজ পাচ্ছিস শুধু তোর মা আর দিদিমাই ত আসে।

মা দিদিমার বদলে বাবা কি উড়ে আসবে নাকি—নির্মলাই তাদের ঝাঁঝালো গলায় শুনিয়েছে—বাবা ত' বিলেতেই গেছে চাকরি নিয়ে। সেখান থেকে ছুট করে বুঝি এলেই হল!

বাড়ি থেকে শেখানো কথাই নির্মলা বলেছে, তবে তার ওপর একটু রং ফলিয়ে। দিদিমা শিখিয়ে দিয়েছিল যে বাবার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করলে যেন বিদেশে আছে বলে। নির্মলা সে বিদেশকে নিজের কল্পনায় একেবারে বিলেত করে তুলেছে।

পড়াশুনায় রীতিমত চৌকস হলেও স্কুলের গণ্ডি পার হওয়া নির্মলার হয়নি। বছর পোনেরোয় পড়তেই তাকে স্কুল ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। কেন হয়েছে তা নির্মলা ভালো করেই জানে।

এইখানে সে বিদেশী মেয়েটির সঙ্গে তফাৎ। বিদেশী মেয়েটিকেও আট বছরে প্রথম বড় মানুষী একটা মেয়েদের স্কুলে তারপর ক্যাথলিক কনভেণ্টে পাঠানো হয়েছিল। পোনেরো বছরে তাকে কনভেণ্ট ছাড়িয়ে এনে তার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবার জন্যে সভা বসিয়েছিল মেয়েটির মা মাসিরা তাদের অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে।

সভার কি দরকার? মেয়েটি জানিয়েছিল সে তার ভবিষ্যৎ ঠিক করেই ফেলেছে।

কি ভবিষ্যৎ?—কেউ মুচকে হেসে কেউ ভ্রুকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিল। মেয়েটি জানিয়েছিল সে 'নান' হবে—মঠের সন্ন্যাসিনী।

শুনে সকলে হেসেই বাঁচে না, বলে কি মেয়েটা? শেষকালে সন্ন্যাসিনী হবে!

কিন্তু মেয়েটির এক গোঁ। ধর্মের জন্যে সন্ন্যাসিনী ছাড়া আর কিছু সে হবে না। মা শেষকালে রেগে বলেছিলেন যে সন্ন্যাসিনী হয়ে মঠে ঢুকতে টাকা লাগে।

টাকা ত তার আছে! মেয়েটি চটপট জবাব দিয়েছিল। তার বাবা যে পঞ্চাশ হাজার টাকার মত তার নামে লিখে দিয়ে গেছেন সেই টাকা!

সভায় যাদের ডাকা হয়েছিল তাদের মধ্যে মায়ের অ্যাটর্নিও ছিলেন। তিনি গম্ভীর হয়ে কঠিন স্বরে বলেছিলেন—সে টাকা আছে তোমার বিয়ের যৌতুক হিসেবে।

পোনেরো বছরের মেয়েটি আকাশের দিকে চোখ তুলে চরম আত্মোৎসর্গের ভঙ্গিতে বলেছিল—আমি ভগবানকে বিয়ে করব।

এটর্নি মশাই-ই সবচেয়ে খাপ্পা হয়ে বলেছিলেন আহাম্মক মেয়েটাকে ঢিট করা উচিত ছোটদের জেলখানার মত কোথাও পাঠিয়ে! মেয়েটি

তাতে এটনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি কিল মেরে, মুখ আঁচড়ে চুল টেনে ছিঁড়ে কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে দিয়েছিল।

এ দৃশ্য শেষ হবার পর মায়ের বন্ধু সম্ভ্রান্ত এক ডিউক শুধু মাথা ঠাণ্ডা করে বলেছিলেন—মেয়েটা জন্ম-অভিনেত্রী। ওকে অভিনয় শেখাবার পাঠশালায় পাঠানো উচিত।

গান-বাজনা অভিনয় শেখাবার পাঠশালা মানে 'কনস্যরভেতোয়ার'!

'কনস্যরভেতোয়ার' শুনেই মেয়ে ত' আঁৎকে উঠেছিল। 'কনভেন্ট'-এ সিসটারদের কাছে সে জেনেছে যে অভিনয় অতি জঘন্য পেশা। অভিনেত্রী—জোর গলায় তাই সে বলেছিল—কক্ষনো হব না।

নির্মলার প্রথম অভিনয়ের জগতে প্রবেশের ব্যাপারটা আলাদা। সন্ন্যাসিনী-টন্ন্যাসিনী হবার কোন আজগুবি ইচ্ছে সে বয়সে তার কখনো হয়নি।

বাড়িওয়ালী দিদিমার কাছে মানুষ হয়ে হাড়ে-মজ্জায় সেখানকার শিক্ষা তার যেন বসে গিয়েছিল। স্কুল ছাড়িয়ে এনে বাড়িতে মাস্টার রেখে তাকে গান-বাজনা নাচ শেখানো হয়েছে। দিদিমার কড়া নজর অবশ্য সারাক্ষণ থাকত। ওই বয়সে মেয়ে যেন কারুর প্রেমে না পড়ে।

নির্মলা তা পড়েনি। প্রেম করবার চেষ্টা যে কেউ করেনি তা নয়। দিদিমার নজর কোথাও একটু ঢিলে হলেই নানাভাবে ফুসলাবার চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে নাচের মাস্টার। চেহারাটা খানিকটা যাত্রার কেষ্টর মত। ভাঙা মুখ কিন্তু রংটা দারুণ ফর্সা আর শরীরের গড়ন-পেটন ভালো। তার ওপর এক রাশ ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল সারাক্ষণ কাকের বাসা করে রাখত। সেইটেই ছিল নাকি তার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মেয়েদের কাছে।

নাচের মাস্টারের সুবিধেও বেশী। গানের মাস্টার ত দূরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শেখায়। নাচের মাস্টারকে হাত ধরতে, গলা কোমর পর্যন্ত কখনো-সখনো ধরতে হয়।

নাচ শেখাতে শেখাতে নীরব চোখে অনেক কথাই বলতে চেষ্টা করেছে

মাস্টার। হাত ধরার সময় আঙুল দিয়ে টিপে দিয়েছে। নির্মলার খারাপ লেগেছে তা সে বলবে না। কিন্তু পাল্টা সাড়া সে দেয়নি। ভুলেও কখনো নয়। একদিন একটু নিরিবিলি পেয়ে নাচের মাস্টার জানিয়েছে সে বোম্বে চলে যাচ্ছে। বলে নির্মলার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছে। নির্মলা নির্লিপ্তভাবে বলেছে শুধু, তাই নাকি।

ইয়ে তুমিও চলো না!—মাস্টার আকুলভাবে সেধেছে, তোমার যা গলা আর চেহারা বোম্বাই-এর ফিল্মওয়ালারা লুফে নেবে! আর নাচে ত আমি তোমায় যা শিখিয়ে দেব সবাই কানা হয়ে যাবে। যাবে নির্মলা ?

দিদিমা যেতে দেবে না—ছোট্ট একটি উত্তরে নির্মলা ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে মাস্টারের সাধাসাধির ওপর।

দিদিমা জানবে কেন ?—মাস্টার পালাবার বিস্তারিত প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

নির্মলা ধৈর্য ধরে শুনছে দেখে বেশ একটু আশাও জেগেছে তার মনে। কিন্তু শেষকালে সব শুনে-টুনে একটি কথায় আকাশ থেকে যেন মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়েছে নির্মলা। শুধু বলেছে—আপনি একাই যান।

সে মাস্টার বিদেয় হয়েছে। এসেছে আরো অনেকে।

ও বাড়ির জীবনে হাতে খড়ি হয়েছে তারপর নির্মলার।

নির্মলা সে জীবন মেনে নিয়েছে বললে ভুল বলা হবে। ওই ছাড়া আর কোন জীবনের জন্যে কোনো সাধই তাকে চেপে রাখতে হয়নি যে কোন রকমে এ জীবনটা মেনে নেওয়ার কথা উঠবে। সে যে পাড়ার মেয়ে, যে রক্ত নিয়ে জন্মেছে, তাতে জীবনের ধারা ত তার একটাই হতে পারে। আকাঙ্ক্ষাও একটাই। রূপে-গুণে ছলায়-কলায় যত শাঁসালো সম্ভব শিকার ধরে যতদিন দরকার বশে রেখে আখের গুছিয়ে নেওয়া। এর মধ্যে সাজবে-গুজবে বেড়াবে-টেড়াবে স্ফূর্তি করবে, ব্যস আর কি চাই ?

তা বড় শিকারই পাকড়াবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল দিদিমা। ধানবাদ রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার খনির মালিক। বয়স একটু হয়েছে, তা না

হলে সাধ করে শিকার হবেই বা কেন ? অগাধ পয়সা। যত পয়সা তার চেয়ে খরচে হাত।

একটা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে রাখতে চেয়েছিল। দিদিমা রাজী হয়নি। তখন এই বাড়িরই ওপরের তলাটা পুরো দখল করে নিয়ে একেবারে ইন্দ্রভবন করে সাজিয়ে দিয়েছিল। দারোয়ানও রেখে দিয়েছিল দরজায়। রোজ আসত না। ব্যবসা ছেড়ে আসবে কি করে ? আসত আর থাকত শনি রবিবারে। নাচে-গানে নেশায় হুল্লোড়ে জমজমাট হয়ে থাকত বাড়িটা সেই দুদিন।

কেমন লাগত নির্মলার ? কেন ভালোই ত। শাড়ি গয়নায় তাকে মুড়ে রাখত, তার ওপর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। খারাপ লাগবে কেন ! দেহ ? সেই বয়সে নিজের শরীরটার ভেতর কোন উদ্দাম উত্তাল ঢেউ কি কোনদিন জাগেনি ?

নির্মলা অন্ততঃ টের পায়নি। জল ত তিন পাত্রের। বাষ্প হয়ে ওঠে, তরল হয়ে গড়ায় আর বরফ হয়ে জমে থাকে। নির্মলা কি বরফ নাকি ? তা হলে দোষ কি ! তাই হওয়াই ত তাদের পেশার শিক্ষা।

সব শিক্ষা-দীক্ষা ভেসে গিয়েছিল কিন্তু একদিন। ভেসে গিয়েছিল এই মহিমের খেলাতেই।

মহিম মজুমদার। সেই গোড়া থেকেই মেজবাবু। মেজবাবুকে রাজ চক্কোত্তিই ধরে এনেছিল একদিন। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল মেজবাবু বলে। অন্য ইয়ার-বন্ধু মোসায়েবদের মত নয়, গলায় রীতিমত খাতিরের সুর লাগিয়ে।

মেজবাবুকে খুব লাজুক ভীরু গোছের মনে হয়েছিল কি, এমন পাড়ায় এমন আসরে এসে ? মোটেই না। শুধু একটু যেন বিরক্ত।

নির্মলারও প্রথম দিন চোখে কোনো নেশা লেগেছিল বললে মিথ্যা বলা হবে। সুন্দর চেহারা তা হয়েছে কি ! সুন্দর চেহারা সে কি কখনো দেখেনি। মেজবাবু বেরসিকের মত আসর জমতে না জমতে উঠে চলে গিয়েছিল। রাজ চক্কোত্তির অনুরোধেও তাকে জল গ্রহণ করানো যায়নি।

গোঁড়ামি আছে বুঝি? মোসাহেবদের কে যেন জিজ্ঞাসা করেছিল— যেখানে সেখানে ছোঁয়া-টোয়া খান না।

হ্যাঁ খুব গোঁড়ামি।—গম্ভীর হয়ে বলেছিল রাজ চক্কোত্তি—দেড়ে বাবুর্চির ছোঁয়া বড় হোটেলের গরু শূয়োর ছাড়া কিছু খায় না।—বলে হেসেছিল ছাদ ফাটিয়ে। এই রকম ছিল রাজ চক্কোত্তির রসিকতা।

মাথায় টাক, গুড়ের নাগড়ীর মত ভুঁড়িওয়ালা চেহারা। কিন্তু চোখ-মুখ ঝলমল করত সারাক্ষণ স্ফূর্তির মেজাজে। যেমন দরাজ দিল তেমনি দুরন্ত প্রাণশক্তি। প্রৌঢ় বলে কোনদিন মনেই হয়নি তাকে।

সেই রাজ চক্কোত্তি হঠাৎ মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল। সেই এক ব্যাপার! ধানবাদ থেকে নিজেই চালিয়ে আসছিল কলকাতায়। লরীর সঙ্গে ধাক্কা আর সঙ্গে সঙ্গে খতম।

নির্মলা কেঁদেছিল কি? না, চোখে তার জল আসেনি, কিন্তু বুকের ভেতর প্রচণ্ড একটা ঘা খেয়েছিল।

জীবন-মৃত্যু নিয়ে সেই প্রথম এক পরম যন্ত্রণায় প্রশ্ন জেগেছিল তার মনে। এই আগের সোমবার সকালে জলজ্যান্ত লোকটা, যেমন তার দস্তুর, ঠাট্টা করে হাসতে হাসতে মোটরে গিয়ে উঠল, আর এই শনিবার সে নেই!

সেদিন জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে যা ভেবেছিল সব ছেলেমানুষী ভাবনা, মানুষ মরে কোথায় যায়? পরলোকটা কেমন? ধর্ম-কর্মের মানে আছে কি না, এমনি সব ভাবনা। কিন্তু সেই বুঝি শুরু।

অনেকদিন ওপাড়ার পক্ষে বেশ অবিশ্বাস্য রকম বেশীদিন নির্মলা সাজগোজ করেনি। গম্ভীর হয়ে থেকেছে সারাক্ষণ। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কথা কেউ বললে রাজী হয়নি।

মা তখন বেশ কিছুদিন হল মারা গেছে। দিদিমা বয়সের ভারে একটু অথর্ব। অথর্ব হলেও নজর তাঁর সবদিকে সমান কড়া। একদিন ডেকে বলেছে, তুই কি থানটান পরে মাছ-মাংস ছাড়বি নাকি? ভেবেছিস কি বলত? বিধবা হবি?

দিদিমার কথা এই রকম বাঁকা চিরকালই। নির্মলা একটু হেসে বলেছে— মাছ-মাংস তো ছাড়িনি থান কাপড়ও পরিনি। তবে অত ভাবনা কেন। আবার বাবু ধরব। ভয় নেই। কথাগুলো হেসে বলা কিন্তু হুলটা বেশ বেঁধানো।

নির্মলা তারপর আবার নিজেকে সহজ স্বাভাবিক করে এনেছে। কিন্তু একটা কেমন গাম্ভীর্যের ছাপ তখনই দেখা দিয়েছে তার মুখে প্রথম। সকাল বিকেল যা তার রুটিন তার কিছুই করতে ভোলেনি নির্মলা। সকাল থেকে যথা নিয়মে সরবাটা মুখে মেখে থেকে স্নানের সময় তা ধুয়ে ফেলেছে। তার রূপের মধ্যে চুলেই যা বড় খুঁত। চুল তার ঘন নয়। পেছনের ঝুল বড় হলেও সামনের মাথায় একটু পাতলা। নিয়ম করে কবিরাজী তেল মাখায় সে ত্রুটি করেনি। বিকেল হলে বেশ সময় নিয়ে প্রসাধন করে চুল বেঁধেছে।

এইসব কিছুর সঙ্গে নতুন একটা কাজ বেড়েছে নির্মলার। কাজ নয় নেশা। সে নেশা হল বই পড়া। বেপাড়ার এক লাইব্রেরী থেকে বই আনাবার ব্যবস্থা করে সে যেন গোগ্রাসে গিলেছে।

প্রথমে শুধু পরলোকের কথা যাতে আছে, মৃত্যুর পর কি হয় না হয় তা নিয়ে যা লেখা এই রকম বই-এর খোঁজ করেছে। সে রকম বই আর কটা পেতে পারে, বিশেষ করে ওই রকম একটা লাইব্রেরীতে! সেই বই-এর সন্ধানে থাকতে থাকতে পড়ার নেশাই জমে গিয়েছে নির্মলার। বুঝুক না বুঝুক সব কিছু সে নির্বিচারে পড়েছে। এক লাইব্রেরীতে কুলোয় নি বলে দূরের আরেক লাইব্রেরীতেও নাম লিখিয়ে মেম্বার হয়েছে।

নামটা অবশ্য মিথ্যে। সেই সঙ্গে ঠিকানাটাও। এ তো আর থানার ডায়েরী নয়। ঠিকানা ভুল দিলে কে আর তাই নিয়ে মামলা করতে আসছে। মাস মাস চাঁদা ঠিকমত দিয়ে গেলেই হল।

এ পড়ার নেশা খুব বেশীদিন অবশ্য থাকেনি। এ নেশা কাটাতে একটু সাহায্য করেছে প্রথম একটি মেজাজ বিগড়ে দেওয়া বই। বইটা তাদের

জীবন নিয়ে লেখা। বইটার মিথ্যে ভণ্ডামিতে গা তার জ্বলে গিয়েছে। নিজেদের দেহই যাদের পণ্য তাদের হয় নিষ্কলঙ্ক সতী, নয় নরকের কীট বানাবার কি প্রাণপণ চেষ্টা। হাসিও যেমন পায় তেমনি রাগও ধরে। একটা ফল অবশ্য এসব বই পড়ায় হয়েছে। নিজেকে, নিজের পরিবেশকে অন্য এক চোখ দিয়ে প্রথম দেখার ক্ষমতা।

কিন্তু তা দেখেই বা লাভ কি? নির্মলা ধর্ম মানে, কর্মফল মানে। যার যেমন কর্মফল নিয়তি তার ঘুঁটির চাল তেমনি বেঁধে রেখে ত দিয়েছেই জন্মের আগে থেকে।

বই পড়ায় ভাঁটা পড়েছে সেই থেকেই। যা পড়তে পেরেছে তাতে নির্মলা বেশ একটু হতাশ। তার মনের গড়ন একটু আলাদা বলেই বোধহয় সাধারণ পড়াশুনার জোরেই সাহিত্য বলে যা বাজারে চলে তার মেকী চটক আর ফাঁকিটা তার কাছে সম্পূর্ণ লুকোন থাকেনি। বই মানেই তার মনে হয়েছে বুঝি এক ধরনের আফিং-এর নেশায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখা। জীবনের নামে একটা সাজানো ছকে মানুষের বদলে কটা ঘুঁটির ধরা-বাঁধা খেলা।

এটা অবশ্য নির্মলার তুর্ভাগ্য! মানুষের জগতে ছাপার অক্ষরে রাশি রাশি যে সওদা কাটে তার বেশীর ভাগ ভেজাল যদি সে একটুও ধরে ফেলতে পেরে থাকে তা হলে সেটা তার তারিফ করবার মত ক্ষমতা বলতে হবে, কিন্তু বই-এর রাজ্য যে ওইখানেই শেষ নয়—সে খবরটা তার কাছে পৌঁছোলে ভালো হতো। এত সহজে পড়ায় অরুচি তাহলে ধরত না বোধ হয়।

পুলকেশ এই পর্যন্ত লিখে থেমেছিল। সন্দেহ হয়েছিল নির্মলার কথাটা ঠিক মত বোধহয় সে বলতে পারছে না। কিংবা ভুলই হয়ত করছে নির্মলাকে বুঝতে! না, নির্মলার কথাটা সে বোঝেনি এমন নয়। নির্মলার মনের ভেতরটা সে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। নির্মলা বই পড়ে। ভালো-মন্দ সহজ কঠিন কোন বই-ই সে বাদ দেয়নি কিছুদিন ধরে।

কিন্তু সবই ত পাড়ার লাইব্রেরীর বই। এ পাড়ার না হয় ও পাড়ার। বাছাই করে আনবারও তার উপায় নেই। সাধারণের ওপরে যে সব বই তা আর গুণতিতে কটি! সব সময়ে পাওয়া যায় না। পেলেও পাড়ার লাইব্রেরীর তালিকায় যা মেলে তা পড়ে শেষ করতে আর ক'দিন লাগে।

নির্মলা সেইজন্যেই হতাশ হয়েছে। হওয়াটা অসম্ভব কিছু কি না— নিজের মনের এ প্রশ্নের সঙ্গে পুলকেশকে গোড়াতে অবশ্য যুঝতে হয়েছে খানিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে সে অটল থেকেছে। না নির্মলাকে সে কলেজে পড়ায় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া যায়নি বলে তাকে এইটুকু আলাদা ছাঁচে ফেলতে দ্বিধার কিছু নেই। তা না দিতে পারলে নির্মলার কথা লেখারই দরকার ছিল না।

নির্মলার ভেতর দিয়ে যেখানে সে পৌঁছোতে চাইছে সেখানে শেষ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে কি না এখনো সে জানে না। একটা আবছা বাষ্পীয় অস্থিরতা তার ভেতর থেকে নির্মলার মধ্যে সবে সঞ্চারিত হতে স্থুরু করেছে। সে মেঘ-বাষ্পকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসার রূপ নেবার সুযোগ দিতে হলে সাধারণ মধুর কি করুণ কোনো কাহিনীর মামুলী নক্সার নিয়তিতে নির্মলা ত বাঁধা থাকতে পারে না। জীবনের বাঁধা চালের ছকের বাইরে থেকে নির্মলা পুলকেশের নেহাৎ অলস খেয়ালে ত আসেনি, তার আসাটা নিরর্থক নয়। তা ছাড়া সেই যন্ত্রণার ঢেউ সবে তার মধ্যে জাগতে স্থুরু করেছে। নকল রং-এ ছোপানো যে সব মায়াজাল দিয়ে আজীবন নিজেদের আমরা ঘিরে রাখি অকপট সততায় তা ছিঁড়ে মুক্তি পাবার জন্যে যা বেগ দেয়।

নির্মলা প্রথম যা ছিন্ন করেছে তা বেশী কিছু অবশ্য নয়, বাইরের মোড়ক মাত্র। সাহিত্যের ছল-ধরা তবকের মত এই মিথ্যার মোড়ক জীবনের অসার অলীক অনেক কিছুকে লোভনীয় ঝলমলে করে রাখে আমাদের মেকী আর ফাঁকির জগতে।

এই ফাঁকি আর মেকীর জগতের যা এক রকম মুকুর সেই অভিনয়ের

মঞ্চে তার গিয়ে ওঠা এক রকম অভাবিত ব্যাপার।

নির্মলা সুন্দরী। তার ওপর নাচগান দুই-ই যা জানে তা তার কাজের পক্ষে যথেষ্ট। তার কাছে প্রার্থী হয়ে যারা আসে তাদের কাছে ছাড়া বাইরে কোথাও নিজের এ সব বিদ্যার বেসাতি করার কথা কোনদিন সে বা তার দিদিমা ভাবেনি। প্রথম এরকম প্রস্তাব যা এসেছিল দিদিমাই তা রুক্ষভাবে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

—কি করবে ইস্টেজে গিয়ে রাজ্যের যত ইল্লুতেদের সামনে ধিঙ্গি হয়ে নাচবে। কেন? নিমির কি মুখে মেচেতা ধরেছে। লোক জোটে না।

কথাটা যে এনেছিল সে একটু বোঝাবার চেষ্টা করেছে। থিয়েটারে নামা মানে লজ্জা অপমানের কিছু নয়। সেখানে পয়সাকে পয়সা, সেই সঙ্গে অনেক মানের ব্যাপার। কত নাম হবে, দেশে দশে জানবে।

দেশে দশে জানলে কি চারটে হাত বার হবে—দিদিমা বুড়ি খেঁকিয়ে উঠে দালালকে বিদেয় করে দিয়েছিল। দিদিমার কথা শুনে হাসি পেয়েছিল বটে নির্মলার, কিন্তু থিয়েটার সম্বন্ধে নিজের কোনো আগ্রহ তার ছিল না।

বিদেশের সেই মেয়েটি কিন্তু কখনো অভিনেত্রী হব না বলে তেজ দেখিয়ে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখেই একেবারে গলে কাদা হয়ে গিয়েছিল। কনভেণ্টে মানুষ। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় কখনো দেখেনি। থিয়েটারে ঘেন্না। প্রথমে তাই থিয়েটারে যেতেই সে চায়নি। একরকম জোরজার করে তাকে নিয়ে গিয়ে বসান হয়েছিল [illegible]মাসিদের সঙ্গে একটি 'বক্স'-এ। বক্সটি আর কারুর নয়, ফ্রান্সে তখন মুখে মুখে যাঁর নাম ফেরে সেই আলেকজাণ্ডার ডুমার। তারা সেদিন তাঁরই অতিথি।

মঞ্চের যবনিকা ওঠার পর থেকেই মেয়েটি যা করতে শুরু করেছে তা রীতিমত কেলেঙ্কারী। স্টেজের প্রত্যেকটি চরিত্রের অভিনয় তার মধ্যে আবেগের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। এই হেসে ওঠে এই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না আর থামাতে পারে না।

শশ্ শশ্ !—চারিধারের লোক বিরক্ত। একজন দর্শক ত রেগে উঠেই চলে গেলেন। মা-মাসিদের ত তখন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। শুধু ডুমা বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েটির অবস্থা। নিজের চেয়ারটা মেয়েটির কাছে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বসে তাকে যেন ভরসা দিতে কাঁধের ওপর হাত রেখেছিলেন।

অভিনয়ের শেষে আচ্ছন্নের মত মেয়েটি যখন আর সকলের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, তখন মেয়েটির ছোট্ট একটি হাত তুলে ধরে চুমো খেয়ে ডুমা বলেছিলেন—গুড নাইট, ছোট্ট তারাটি !

সেই ছোট্ট তারাটি একদিন পৃথিবীর আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা হয়েছিল।

বিদেশী মেয়েটির অভিনেত্রী জীবনের সূচনা কিন্তু নির্মলার সঙ্গে মেলে না। সে মেয়েটি ডুমা আর অন্য নামকরা হিতৈষীদের সুপারিশে সঙ্গীত ও অভিনয় করার সবচেয়ে বড় পাঠশালা কনস্যরভেত্তোয়ার-এ দু'বছর পড়ার সুযোগ পেয়েছিল।

তারপর তার সৌভাগ্য হয়েছিল ফ্রান্সের তখনকার সবচেয়ে নামকরা থিয়েটারে অসামান্য একটি ভূমিকায় নামবার। সে সৌভাগ্যের মর্যাদা রাখতে সে পারেনি। কোন রকমে কথাগুলো শুধু মুখস্থ বলে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে অনেক আশা যাদের ছিল, সকলেই অবাক মর্মাহত। মেয়েটিরও লজ্জা দুঃখের সীমা নেই। অভিনয়ের যিনি গুরু, একেবারে ভেঙে পড়ে মেয়েটি তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

আমি ক্ষমা করতে পারি হয়ত—অনেক দুঃখে গুরু বললেন—কিন্তু পরপার থেকে র‍্যাসিন কোনদিন করবেন না।—ভূমিকাটি ছিল র‍্যাসিনের একটি নাটকের নায়িকার।

শুধু ওই ভূমিকাটিতেই নয়, একদিন অভিনয় জগতে বিশ্বের সম্রাজ্ঞীর মুকুট যে পাবে, সে মেয়েটি এরপর কোন অভিনয়েই তার সম্বন্ধে প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি।

ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নাট্য-সমালোচক তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে যা

লিখেছেন তার মর্ম কতকটা এই যে, 'রঙ্গমঞ্চে নতুন যারা নেমেছে, পাখা দেখেই তাদের সবাইকে পাখী যেন না ভাবা হয়। এর মধ্যে কেউ কেউ মাটি ছেড়ে কোনদিন উড়বে না।'

প্রথম রঙ্গমঞ্চে নেমে ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছা যাবার মত হয়েছিল নির্মলারও! আলিবাবার পালা। মর্জিনা সেজে স্টেজে বার হতে গিয়ে উইঙ্গস-এ নির্মলার পা দুটো যেন আটকে গিয়েছিল। চোখে তখন সে অন্ধকার দেখছে। আবদাল্লাকে স্টেজ থেকে এসে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠেলে দিতে হয়েছিল স্বয়ং মহিম মজুমদারকে। কিন্তু স্টেজে একবার নামবার পর কী যেন অলৌকিক ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল। নাচের শেষে হাত-তালি আর এনকোর অনেকক্ষণ থামতে চায়নি। দর্শকদের সে উৎসাহ আর উচ্ছ্বাস অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত ছিল উদ্দাম! শেষ যবনিকাই পাঁচবার নানাতে ওঠাতে হয়েছিল। মহিম মজুমদার হুকুম দিয়ে না বন্ধ করলে আরো কবার 'কার্টেন ফল' চলত কে জানে? কাগজগুলোও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিল তার পরে। নির্মলার অভিনেত্রী জীবনের আরম্ভটা এমনি।

আরম্ভের একটা আরম্ভ অবশ্য আছে। নির্মলার নাট্যজগতে আসার কথা কে ভাবতে পেরেছিল। নির্মলা নিজে ত' নয়ই। প্রথম এ প্রস্তাব যে এনেছিল সে অবশ্য সামান্য দালাল মাত্র। দালাল ব্যর্থ হয়ে ফেরবার পর খোদ মালিককেই আসতে হয়েছিল একদিন। গরজ বড় বালাই বলেই বোধহয়। মালিককে দেখে নির্মলার বাড়ির সবাই অবাক। মালিক আর কেউ নয়, মহিম মজুমদার মানে মেজবাবু! সে অবশ্য তখনকার আরেক মেজবাবু। পোষাকে-আশাকে একেবারে পাক্কা সাহেব। যে গাড়িটায় চড়ে এসেছিল রাজ-চক্কোত্তির গাড়িটাকেও তা কানা করে দিয়েছে।

এসব ঠাট-ঠমকে আসল চিঁড়ে কিন্তু ভেজেনি। নির্মলার দিদিমা সোজা বলে দিয়েছে যে থিয়েটার-টিয়েটারে নামা তাদের কুষ্ঠিতে নেই। যত টাকাই দাও থিয়েটারে কোমর দোলাতে নির্মলা যাবে না।

কিন্তু থিয়েটার মহিম মজুমদারের তখন পাগল-করা নেশা। সেই সঙ্গে

পড়শী আর এক মঞ্চের সঙ্গে বাজি ধরে পাল্লা চলেছে তার। তারা তখনকার সবচেয়ে নামকরা হিরোইনকে গেঁথে ফেলেছে। কুছ পরোয়া নেই।—বড়াই করে বলেছে মহিম মজুমদার। ওদের বুড়ি হিরোইনকে কাশীবাসে পাঠাবার মত নায়িকা যদি না নামাতে পারে তাহলে সে চক্‌বাড়ির মজুমদার নয়!

রাজচক্কোত্তির মাইফেল-এ দেখা মেয়েটার কথা তখনই মনে পড়েছিল মহিম মজুমদারের। মেজাজটা তার অবশ্য সেদিন ভালো ছিল না। কিন্তু সেই বিরক্তির চোখেই মেয়েটাকে যতটুকু দেখেছিল তাতে একটু ঘষা-মাজা করলে পাথর ক্ষয়ে হীরের ঝিলিক বার হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

রাজচক্কোত্তি মারা গেছে। অমন দিলদরাজ কোনো কাপ্তেন মেয়েটার ভাগ্যে নিশ্চয় তারপর জোটেনি। কিন্তু তুড়ি দিয়েই যাকে বাগানো যাবে ভেবেছিল সে যে এমন বাঁকা সুর গাইবে কে জানত। মেয়েটা নিজে না হোক বুড়ি-শকুন তার দিদিমাটা। থিয়েটারের কথাটা যেন ঘেন্নায় কানেই তুলতে চায়নি।

মহিমেরও তখন জেদ চেপে গেছে। এই মেয়েটাকে সে তার থিয়েটারে নামাবেই। শেষ পর্যন্ত দিদিমার কাছে সে একটা প্রস্তাব করেছিল। দিদিমা সেটা ঠেলে ফেলতে পারেনি।

রাণীগঞ্জের রাজচক্কোত্তির বদলে চকবাড়ির মহিম মজুমদার। বেশী বই কম কথা নয়। রাজচক্কোত্তির কুবেরের ভাঁড়ার ছিল মাটির নিচের খনিতে, আর মহিম মজুমদারের হল মাটির ওপরে—দালান কোঠায়। এই কলকাতা শহরে চকবাড়ির মজুমদারের কত যে বাড়ি, তা বুঝি গুনে শেষ করা যায় না। সিংহভাগ সবই বড় তরফের।

সে সিংহভাগেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু কুলোয়নি। প্রায় সব গলে গেছে এক থিয়েটারের নেশায়। আর তারপর সিনেমায়। সেই সঙ্গে শরীকী মামলা শুরু হয়ে কবাড়ির ভিতে ঘুণ ধরিয়েছে।

গলে যা গিয়েছে সাধারণ নিয়মে তারও বেশীর ভাগ নির্মলার আঁচলেই বাঁধা হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি, নির্মলার নিজের স্বভাব দোষেই

বলতে হবে। তার থিয়েটারে নামবার পর কিছুদিন বাদে দিদিমা বুড়ি মারা গেছে। মাথার ওপর টিক-টিক করবার কেউ নেই। নির্মলা এতদিন বাদে জাতের ধর্ম ভুলে প্রেমে পড়েছে, একেবারে হাবুডুবু খাওয়া প্রেম! সমাজ কি শাস্ত্র কোন খুঁটির বাঁধন যাদের নেই তারা যখন নিজেকে সঁপে দেয় কারুর কাছে তখন ক্রীতদাসীর অধম হয়।

তাই হয়েছে নির্মলা। প্রথমতঃ থিয়েটারের তারপর সিনেমার ফুটো বোজাতে চকবাড়ির ক্ষমতায় যখন কুলোয়নি, তখন নিজের পুঁজিতে হাত দিয়েছে নির্মলা। দেওয়াটা কিছু অন্যায় অস্বাভাবিক মনে হয়নি। মেজবাবুর সঙ্গে নিজেকে আলাদা করে তখন সে ভাবতে পারে না। হ্যাঁ, থিয়েটারের মজুমদার সাব তখন মেজবাবু হয়েছেন পুরোপুরি। মেজবাবুর তখন বাড়ি-ঘর সব এইখানেই।

ভালবাসায় পাগল হয়ে যাওয়া কাকে বলে নির্মলা সেই প্রথম বুঝেছিল, নিজের দেহটাকে যেন আবিষ্কার করেছিল সেই প্রথম।

সিনেমার কাজে আর মামলার খাতিরে মেজবাবুকে বোম্বাই দিল্লী কলকাতা তখন করতে হয়। নির্মলার অসহ্য মনে হ'ত সেই দু-চার দিনের বিচ্ছেদ। নিজের জন্যে কান্না পেত, আর দেহটার ওপর হত রাগ আর ঘৃণাও বুঝি খানিকটা।

এই প্রচণ্ড প্রেমের জোয়ারের ভেতরেই মহিমের সঙ্গে থিয়েটার নিয়ে তার মতান্তর চলছে তখন। টাকা-পয়সার ব্যাপারে নয়, নাটক নিয়ে, অভিনয় নিয়ে, প্রযোজনা নিয়ে। নির্মলার মনের আরেক মায়াবরণ তখন বোধহয় ছিঁড়ে যাবার মুখে।

নাটক নিয়েই সবচেয়ে অশান্তি শুরু হয়েছে। নাট্যজগতের স্বনামধন্য নাট্যকার। একবার তাঁর নাটক মঞ্চে উঠলে হাজার রাতের আগে আর থামতে চায় না। নির্মলা তাঁরই লেখা নাটক বদলাতে বলেছে মহিমকে! বলেছে অবশ্য স্বয়ং নাট্যকারের সঙ্গে অনেক তর্কাতর্কির পর। নাটকের চরিত্র, তাদের মনের গতি আর মুখের সংলাপ নিয়েই তর্ক। প্রথমে সম্মান রাখার চেষ্টা করলেও এক সময়ে নির্মলা বলে ফেলেছে—

আপনি নিজের চরিত্রদেরই চেনেন না মনে হচ্ছে।

'পুরোপুরি কেই বা চিনতে পারে'—মন্তব্যটা প্রশংসাসূচক বলে ধরে নিয়ে নাট্যকার ধোঁয়াটে বাণী ছেড়েছে—একবার আমাদের কলম ফসকে বার হলেই ওরা স্বাধীন।

আমি সে কথা বলিনি!—একটু নীরস গলাতেই নির্মলা নাট্যকারকে থামিয়ে দিয়েছে—আমি বলতে চাইছি চরিত্রগুলোর কোন স্পষ্ট ধারণাই আপনার এ নাটকে পাচ্ছি না। তারা শুধু কটা বাঁধাধরা অবস্থায় গোটা-কতক লাগসই বকুনির গ্রামোফোন।

তাই মনে হচ্ছে তোমার?—নাট্যকার মুখের হাসিটা মুছতে দেননি, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে তাঁর অবজ্ঞাটা লুকোন থাকেনি। সে দৃষ্টিতে তাঁর নীরব মন্তব্যটা যেন স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। মর্জিনার পার্টের নাচুনী আজ নাটক নিয়ে কথা বলছে!

আচ্ছা ভেবে দেখি। ব'লে নাট্যকার উঠে চলে গেছেন। তারপর কৌতুকের ভান করে মহিম মজুমদারকে সব কথা জানিয়েছেন।—ওর কথাটাই কিন্তু বেশ লাগসই!—হাসতে হাসতে বলেছেন নাট্যকার—বলে কি না গোটা কতক লাগসই বকুনির গ্রামোফোন!

হাসি হাসি মুখে একথাও ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার যে মহিমের হিরোইন যদি এ রকম অনধিকার চর্চা আর করে তাহলে তিনি এ নাটক অন্য কোথাও দেবেন।

মহিম সে কথা উদ্বিগ্ন হয়ে নির্মলাকে জানাতে যেতেই গোলমাল বেঁধেছে। নির্মলা সোজাসুজি নাট্যকার ও নাটক বদলাতে বলেছে।

মহিম মজুমদারের অবস্থা তখন কাহিল। চকবাড়ির কুবেরের ভাঁড়ার তখনই তলানিতে ঠেকেছে। বাজারে দেনা বাড়ছে। এ নাট্যকারকে বাদ দিলে অকুল পাথারে পড়বে। কোথাও কেউ আর নগদ ছাড়া কারবার করতে চাইবে না। তা ছাড়া অন্য নাট্যকার খুঁজে নতুন নাটক যোগাড় করাও ত অনিশ্চিত ব্যাপার। কতদিনে সে নাটক নামাতে পারবে তার ঠিক নেই। ততদিন স্টেজ খালি রাখা মানে সর্বনাশ।

মতান্তরের অনেকদিন কোন মীমাংসা হয়নি।

নির্মলার কাছে তখনই রঙ্গমঞ্চের জীবন বিস্বাদ হতে শুরু হয়েছে। অনেক টাকা ওই নেশায় ডুবে গেছে। তা যাক। ছায়াছবি বানাবার চেষ্টাতেও কম লোকসান হয়নি। সে সব আর উদ্ধার হবার নয় বলে ছেড়ে দিক মেজবাবু। মেজবাবু তা ছাড়েনি। ছাড়তে পারবে না। অবুঝ একগুঁয়ে বলে নির্মলারই দোষ ধরেছে। অভিমান করে নির্মলা থিয়েটার ছেড়ে চলে গিয়েছিল। একবার নয় তিন তিনবার। গিয়ে সেই পুরোনো ডেরাতেই উঠেছিল। সে বাড়িতে দিদিমার ইজারা সে নিজের নামে আর করিয়ে নেয়নি। দরকার বোধ করেনি তার। এখন সেখানে সে ভাড়াটে মাত্র। একটা ভালো কামরায় অবশ্য। নিজের যা কিছু পুঁজি সব ত মেজবাবুর থিয়েটারে ঢেলে দিয়ে এসেছে। পেট চালাতে ত হবে। সে তাদের চিরকেলে ব্যবসাতেই ফিরে গেছে!

খুব যন্ত্রণার সঙ্গে কি! না যতটা ভেবেছিল ততটা যন্ত্রণা হয়নি। সব যেন কেমন অসাড় হয়ে গেছে। দেহ মন সব।

আরেক আবরণ সরে গেছে বুঝি নির্মলার হৃদয় মনের ওপর থেকে। ধরে রেখো না। কিছুই ধ্রুব বলে ধরে রেখো না। নিজেকে কোথায় খুঁজছ? তোমার দেহে? তোমার মনে? সেখানে নেই। তাহলে কি আত্মায়?

সেই খোঁজেও বেরিয়ে গিয়েছিল একবার নির্মলা। মাথা মুড়িয়ে অলঙ্কার থেকে অহংকার সব কিছু ত্যাগ করে। গিয়েছিল অবশ্য তিন তিনবার মহিমের থিয়েটার থেকে চলে আসার অনেক পরে। তিন তিনবার চলে আসা ত তার বৃথাই হয়েছিল।

প্রত্যেক বার মহিম এসে আবার তাকে সাধাসাধি করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। না গিয়ে পারেনি নির্মলা। দেহের মধ্যে উত্তাল ঢেউ-তোলা যে আকর্ষণ তা হয়ত শিথিল হয়ে গেছে, কিন্তু তার জায়গা নিয়েছে মমতা। অসীম মমতা। সেই মমতাই তাকে যেতে বাধ্য করেছে মহিমকে বাঁচাতে। দেনার দায়ে ডুবে যাওয়া মেজবাবু, একদিন যে চকবাড়ির বড়

তরফের পাকা সাহেব ছিল। নির্মলা থিয়েটারে ফিরে গিয়ে সেই জনপ্রিয় নাট্যকারের নাটকেই অভিনয় করেছে কুইনিন গেলার মত করে লাগসই ফাঁকা বুলির গ্রামোফোন হয়েছে।

নাটক সফল হয়েছে বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে। হাউস ফুল বোর্ড পড়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু ঢাকীর দায়ে তখন মনসা বিকিয়ে আছে। মেজবাবুকে বাঁচানো যায়নি;

না ঠিক তাও নয়। মেজবাবুর টাকা দিয়ে অনেক সুরাহা বোধহয় হয়েছে। দেনা অনেক মিটেছে। চালু 'হিট' নাটকের জোরে বাজারে ক্রেডিট বেড়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। মহিম মজুমদার তার ওই মেকী আর ভেজালের জগৎ থেকে বেরিয়ে আসবে না।

পুলকেশ ছটফট করছে অস্থিরতায়।

কি করবে এবার নির্মলাকে নিয়ে। নিজেকে সে আত্মার মধ্যে খোঁজার কথা ভেবেছিল না। সন্ন্যাসিনী হয়ে ঘুরেছিল তীর্থ থেকে তীর্থে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু যা খুঁজছিল তা পেয়েছে কি!

থিয়েটার! সেই থিয়েটার—যেখানে যায় সর্বত্র।

নির্মলার চোখে মিথ্যা মোহের অঞ্জন নেই। সে সব ভেদ করে দেখতে পায়। মৌতাত-ধরানো ছক-বাঁধা কাহিনীর ফাঁকিতে সে ভোলেনি। দেহে ও মনে প্রকৃতির দম-দেওয়া পুতুল হওয়ার নিয়তি অস্বীকার করেছে। আত্মার খোঁজ থেকেও ফিরবে। পুলকেশই নির্মলাকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কোথায়?